সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মুহম্মদ আবদুল হাই

অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বি-এফ্-এইচ্ পাবলিশিং হাউস
তেজগাঁ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়া,
ঢাকা।

বি-এফ্-এইচ্ পাব্লিশিং হাউস-এর পক্ষ থেকে
মোহাম্মদ শামসুল হক কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪।
মূল্য—৩॥০

মরহুম ওয়ালেদ

জনাব আবদুল গনি—কে

ভূমিকা

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা ব্যপদেশে বিগত বারো বৎসরের চিন্তা ও সাধনা বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধাকারে নানা পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করি। সেগুলোকে বিস্মৃতির হাত থেকে উদ্ধার ক'রে এ গ্রন্থে একত্রিত ক'রে দিলাম। প্রবন্ধগুলো আপাত-বিচ্ছিন্ন ব'লে মনে হলেও বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে ভাষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের যে বিকাশ হয়েছে মূলত তারই আলোচন ব'লে প্রবন্ধগুলোর মধ্যে চিন্তাধারার একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে। দেশের সুধী ও ছাত্র সমাজে এ বইটি গৃহীত হ'লে আমার শ্রম সার্থক হবে।

পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আমাদের দেশের পাব্‌লিশাররা এ ধরণের বই আদৌ প্রকাশ করতে চাননা, তবু বি-এফ্‌-এইচ্‌ পাব্‌লিশিং হাউসের পক্ষ থেকে বন্ধুবর শামসুল হক এ বই প্রকাশের জন্য যে শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তার জন্য তাঁকে জানাই অকুণ্ঠ মোবারকবাদ।

মু, আ, হাই

বাংলাবিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
অগাষ্ট, ১৯৫৪।

সূচীপত্র

ভাষা ও সমাজ-জীবন

বিংশ শতাব্দী-পূর্ব যুগের ভাষা তাত্ত্বিকেরা mentalistic দর্শনকে কেন্দ্র ক'রে ভাষার পঠন পাঠন করতেন। এ-দর্শনের মূল কথা হচ্ছে যে, ভাষা মানুষের চিন্তা দ্বন্দ্ব আশা আকাংখা আবেগ উদ্বেগের আকর। কিন্তু এ-শতাব্দীর বিগত কয়েক দশকের ভাষাতাত্ত্বিকদের দর্শনের ভিত্তিমূল mechanistic. এদের দর্শনের বিশেষ বক্তব্য এই যে, জ্ঞান ও চক্ষু গোচর (empirical) না হ'লে কোনো জিনিষেরই প্রমাণ দেওয়া যায় না। ভাষাকে চিন্তা ও দ্বন্দ্বাবেগের বাহন ক'রে মনের কুক্ষিগত করলে ভাষা জ্ঞান ও চক্ষু গোচর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের বাইরে চলে যায়। মানুষের মন দুর্জ্ঞেয় রহস্যাবৃত। ভাষাকে সেই রহস্যের পর্যায়ভুক্ত করলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা বিশ্লেষণ সহজ সাধ্য হয় না. অনেকটা ধোঁয়াটে ঘোলাটে হয়ে ওঠে। সাহিত্যে এ দৃষ্টিভংগীর স্থান আছে ; কিন্তু বিজ্ঞানে নেই। অথচ বিশেষ সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে যে ভাষা বিনিময় হয়, mechanistic বা behaviouristic দর্শনের ভিত্তিতে তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই হয় বুদ্ধিগ্রাহ্য। এঁরা বলেন, সমাজের যে-পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মুখ থেকে কথা ঝরে পড়ে, এ দর্শনকে ভিত্তি করলে ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগীতে উক্ত পরিপ্রেক্ষিত থেকে শুরু ক'রে মানুষের বিশেষ বাচন ভংগীতে উচ্চারিত শব্দ কিংবা শব্দ মণ্ডলীর সাহায্যে গঠিত বাক্য, সেই বাক্যের একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সমন্বয়, তার ধ্বনি ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য এবং পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি বাক্যটির বিশেষ একটি অর্থ অত্যন্ত সহজ ভাবেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাক্যটি উচ্চারিত হবার সময়ে কিংবা তার পূর্বে কথকের মনে কি চিন্তা বা কোনো চিন্তা আদৌ উদ্রিক্ত হয়েছিল কিনা তা অনুসন্ধান

করার কোনো প্রয়োজনই আর থাকে না। পরবর্তী দার্শনিক গোষ্ঠীর মতে ভাষা সমাজ বিজ্ঞানেরই এক বৃহত্তম অংশ। ভাষার বৈজ্ঞানিক পঠন পাঠন ব্যতিরেকে সমাজ বিজ্ঞানের যথার্থ তথ্যোদ্ধার সম্ভব নয়। এ-কথাগুলি স্মরণ রেখে এ প্রবন্ধটি পড়লে ভাষা সম্বন্ধে আধুনিক ইউরোপীয় মনীষীদের অভিমত এবং আমার বক্তব্য অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে আসবে।

মানুষের জীবনে সহজলভ্য জিনিষের প্রতি মানুষ তেমন শ্রদ্ধাশীল নয়। এ হেন শ্রদ্ধাহীনতা যে অবজ্ঞার লক্ষণ আমি তা' বলছি না। ক্ষেত্রবিশেষে হলেও হ'তে পারে, কিন্তু অধিকাংশের জীবনেই তা উদাসীনতার সাক্ষ্য বহন করে।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ-জীবনে মানুষ যখন খুশী, যেমন খুশী ও যা' খুশী ভাষাকে তেমন ক'রে আপন কাজে লাগাতে পারে ব'লে ভাষা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কোনো ভাবনার দরকার হয় না। সেজন্যই মানুষ ভাষা সম্বন্ধে ভাবেও না। মানুষের সামাজিকতার সৃষ্টি, লালন-পালন ও বৃদ্ধি সম্ভব হয় একমাত্র ভাষার সাহায্যে—এ কথা কি আমরা ভাবি? আমাদের স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বেলায় আমরা গতানুগতিক যে কথা শিখে এসেছি ও শেখাচ্ছি তার সারমর্ম হলো যে, ভাষা সাহিত্যের বাহন। ভাষা মানুষের জীবনের আশা, আকাংখা, চিন্তা, দ্বন্দ্ব, আবেগ, উদ্বেগ, মানসিক চঞ্চলতা ও অন্তরজীবনের সুখ দুঃখের সংগীত, মূর্চ্ছা ও মূর্ছনার ধারক ও বাহক। ভাষাই মানুষের জীবনের বন্ধন ও মুক্তির সন্ধান দিতে পারে, তার জীবন চেতনার রসাভাস ঘটাতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। সাহিত্য-বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের অপরূপ মিলনজনিত একটি বিশ্বাস সাধারণ ভাবে প্রচলিত আছে। সাহিত্য-সৃষ্টির পথে ভাষার প্রভাব অনস্বীকার্য এবং ভাষার ভালো-মন্দের তারতম্যে সাহিত্যেরও মান নিরূপিত হয়, এও অবধারিত। তবু আমার বলার কথা এই যে, ভাষায় সাহিত্যের একচেটিয়া অধিকার নেই।

ভাষার মাধ্যমে এবং ভাষাকে কেন্দ্র ক'রেই মানুষের সভ্যতার বিকাশ পথে বহুবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য শিল্পের জন্য মানুষ বিভিন্ন রকমের ভাষার প্রয়োগ করেছে। ভাষার মাধ্যমে সমস্ত শিল্প সাধনার প্রকাশ সম্ভব হলেও এবং সমষ্টিগত ভাবে এদের ধারণক্ষম আধারকে ভাষা নামে অভিহিত করলেও দেখা যায় যে, বিষয় বিশেষের জন্যে বিশেষ রকমের ভাষার প্রয়োগ হয়ে থাকে।

সাহিত্যে মানুষের জীবনের ছবি আঁকা হয়। নানা সমাজ সম্বন্ধের ভিত্তিতে মানুষের জীবন; লঘু, জটিল ও দুরবগাহ। সমাজের এই লঘু স্বাচ্ছন্দ্য ও গহন জটিলতাই মানুষের জীবনকে মহনীয়তা দান করেছে। মানুষের এই জীবনের আলেখ্য নির্মাণে যে-ভাষার প্রয়োগ হয় তার নির্দিষ্ট একটি ধাঁচ আছে। সাহিত্য ভাষার সেই বিশেষ ছাঁচের উপর দাঁড়ায়। ঠিক তেমনি বিজ্ঞান ও শিল্প-কলার এক একটি শাখার জন্যে এক এক রকমের ভাষা। যদি ভূগোলে এক রকম ভাষার প্রয়োগ হয় তবে ইতিহাসে অন্যরকম; যে-ভাষা দিয়ে গাণিতিক হিসাব নিকাশ করা হয়, দর্শন শাস্ত্রে সে-ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ করা যাবে না। ভাষার যে-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা রসায়ন শাস্ত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়—ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ-বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি কি সমাজ বিজ্ঞানের বিচারে সে-ভাষার স্থান নেই। এক এক বিজ্ঞানের জন্যে ভাষা ব্যবহারের এক একটি technique আছে। আমরা স্বীকার করি বা না করি ভাষা ব্যবহারের বেলায় আমাদের জ্ঞাত কি অজ্ঞাতসারে এই বিশেষ পরিভাষার শাসন ও দৌরাত্ম্য আমাদেরকে মেনে চলতে হয়।

এ-কথা সত্য, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে কালে কালে দেশে দেশে মানুষ তার গবেষণার, আশা আকাংখার, কামনা ও বাসনার নানা চিহ্ন রেখে গেছে। সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে মানুষ গড়েছে শহর, নগর, গ্রাম স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, চীনের প্রাচীর, পাক-ভারত উপমহাদেশের অজন্তা,

মহেঞ্জদরো, হারাপ্পা, কণার্ক ও ভুবনেশ্বরের মন্দির ; আগ্রার তাজ, মিশরের পিরামিড ইত্যাদি এমনি কত কি ! এ-সবেরই ভেতর দিয়ে এক এক যুগের মানুষ তাদের আশা আকাংখা যেমন প্রকাশ করেছে, তেমনি নিজেদের সৃষ্টি সম্ভারের ভেতর দিয়ে অমরত্বের লোভও তাদেরকে কম মোহিত করেনি। কত দর্শন ও বিজ্ঞানের, কত মত ও পথের কত আবির্ভাব হয়েছে, বিস্মৃতির অতলে গেছে কত মত ও পথ সর্বজয়ী কালের কুক্ষিতে তলিয়ে। ভাষাকে কেন্দ্র ক'রে ভাষারই মাধ্যমে বিকাশ পেয়েছে কাল-স্রোতে এ মত ও পথগুলো এবং মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও অমরত্বের নিদান বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পের সাধনা।

অতএব সাধারণের বিশ্বাস মতে মানুষের ভাষা যে মানুষের আশা আকাংখা তার চিন্তা, তার জন্ম-মৃত্যুর ইতিহাস ; সুখ-দুঃখের মিলন বিরহের হাসি কান্নার আনন্দ ও বেদনার রহস্য উন্মোচন ক'রে দেয়,— রচনা ক'রে দেয় তার জীবন ও জগতের সকল কাহিনী তা' মানতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথিবীতে অগণিত মানুষের ইতিহাসে সভ্যতার এই নিদর্শনগুলোর ঠাঁই কতটুকু ? শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান দর্শন, সংগীত, স্থপতি ভাস্কর্য মানুষেরই চিন্তা ও কল্পনার নিদর্শন। যুগে যুগে এগুলোই মানুষের ইতিহাসে মানুষের জাতি বিশেষকে অমর ক'রে রাখে। মানুষের অমরত্বের নিদান সত্ত্বেও এগুলোর স্রষ্টারা যেমন দেশ ও জাতি বিশেষের ইতিহাসে সংখ্যার দিক থেকে নগণ্য, তেমনি মানুষের মুখের ভাষাকে মানুষের চিন্তা, হৃদয়ের দ্বন্দ্বাবেগ, প্রেম, স্নেহ, ভক্তি ও মাধুর্যের আকর হিসেবে কল্পনা করলে ভাষার শক্তি ও গণ্ডীকে সীমাবদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়। এতে দুনিয়ার সকল মানুষের স্বাভাবিক সম্পদ ও অধিকারের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে আসে।

এবারে আমার শ্রোতা কিংবা পাঠকেরা আমাকে প্রশ্ন করবেন এত ভূমিকা না ক'রে ভাষা সম্বন্ধে তোমার বক্তব্যটা কি নিতান্ত সুবোধ বালকের

মতো চটপট বলে ফেললেই তো হয় বাপু! আমিও ভাবছি ওপথে এগুলো আমার শ্রোতারা এতক্ষণ আমার স্বরযন্ত্র (larynx) থেকে নির্গত ধ্বনি তাঁদের কর্ণ-পটাহে (ear-drum) যে বারংবার আঘাত হানছে তা থেকে নিষ্কৃতি পেতেন, কান উঁচু ক'রে এবং প্রশ্নকাতর মন নিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকতেন না। এবং আমার পাঠকেরা আমার প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে নিজেদের সংগে আমার কিংবা নিজের সংগে নিজের বাক বিনিময় করতেন না। কিন্তু না করেই বা উপায় কি? আমাদের সাহিত্য সমিতির মিলিত সমাজ মন সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করলেন যে, একদিন আমি আমার স্বরযন্ত্র থেকে কতক্ষণের জন্যে অনবরত ধ্বনি করবো আর তাঁদের কর্ণ-পটাহ আহত হ'তে থাকলেও কিছুকালের জন্য নির্বিবাদে তাঁরা স্থির থাকবেন এবং আমি আমার বিণাবিনিন্দিত কণ্ঠধ্বনি (আত্মপ্রশংসা করছি, শ্রোতা এবং পাঠকেরা মাফ করবেন) শেষ করলে প্রতিক্রিয়া ধর্মে সাড়া দিতে গিয়ে কেহ বা মুগ্ধ হবেন, কেহ বা বিরক্তি বোধ করবেন আর কেহ বা কৌতূহল বশত প্রশ্ন-বাণে আমাকে বিদ্ধ করবেন।

আজকের দিনে আমাদের দেশের কতকগুলো মানুষ মিলে আমরা একটি বিশেষ মঞ্চ রচনা করেছি এবং সেই মঞ্চে আমাদের সমাজ জীবনের একটি অঙ্ক অভিনীত হচ্ছে। আমাদের মঞ্চের নাম সাহিত্য-সমিতি এবং অঙ্কটির নাম 'ভাষা ও সাহিত্য আলোচনা'। যুগে যুগে বিশেষ বিশেষ সমাজ মন সমাজের বহুজন স্বীকৃত কতকগুলো অর্থবোধক ধ্বনির বা ধ্বনিগত অর্থ-বোধক সঙ্কেতের সাহায্যে সেই সমাজ জীবন চালু রাখে। এই অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টির নামই ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ বিশেষ সমাজ জীবনের জন্য বিশেষ ভাষা। বাঙালীর কাছে যেমন বাংলা তেমনি ভূখণ্ডের অন্যান্য অধিবাসীদের কাছে তাদের আপনাপন ভাষা।

দুনিয়াতে যত রকমের দুর্জ্ঞেয় রহস্য আছে, মানবশিশুর ভাষা আয়ত্তকরণ তাদের অন্যতম। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানে ভাষা বিশে-

ষের কিংবা ভাষা গোষ্ঠীর অনেকগুলোর মূল যা-ই হোক না কেন, আধুনিক বর্ণনাত্মক ভাষা বিজ্ঞান মতে প্রত্যেক ভাষার জ্ঞান গোচর ও চক্ষুগ্রাহ্য মূল হচ্ছে মনুষ্য শিশুর মুখ বাজনা বা babbling. দুনিয়ার কোন শিশুই কোনো বিশেষ ভাষা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে না। জন্মের পরমুহূর্ত থেকেই সে মাতৃজঠরগত-শিক্ষা স্বরযন্ত্রের বা laryinx-জাত গলা বাজিতে অভ্যস্ত হয়; অর্থাৎ কান্নার অভ্যাস নিয়েই যেন ধরার ধূলায় পা' দেয়। তারপর মাস দুয়েক থেকে যতই সে বড়ো হ'তে থাকে, ততই মুখ ও ঠোঁটের ব্যায়াম জাত ধ্বনির মাহাত্ম্য সে অনুভব করতে থাকে। সে দেখে, কাঁদলেই তার পরিচারিকা ছুটে আসে, অন্য কোনো ধ্বনি করলে মা বাবা নানি দাদি, ভাই বোন তার হাসির ও খেলার শরীক হয়। এমনি ক'রে নবীন মানব শিশু আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাদ পায় আর তার বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে, খেলার সাথী, আদর আবদারের পোষক মা বাবা, ভাই বোন এবং ঘর ও পরের অন্যান্যদের কাছ থেকে কান ও চোখ খুলে রেখে অনুকরণ ক'রে নানা ভুল ভ্রান্তি, ত্রুটি বিচ্যুতি গ্রহণ, বর্জন ও পরিশোধনের ভেতর দিয়ে ভাষার ব্যবহার শেখে এবং ধীরে ধীরে বয়োবৃদ্ধির সংগে তার অজ্ঞাতসারে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। একটি মানুষের জীবনে ভাষার ইতিহাস এমনি দুর্জ্ঞেয় গ্রহণ-বর্জনের ইতিহাস। সারা জীবনেই পারিপার্শ্বিক জগৎ ও পরিবেশ থেকে ভাষার এমনি আহরণ চলে।

এবারে যদি দোলনা থেকে খাটিয়া পর্যন্ত একটি মানুষের বিস্তৃত জীবনেতিহাস আলোচনা করা যায় তা হ'লে জীবন রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন অঙ্কে তাকে নানা ভাবে অভিনয় করতে দেখা যাবে। কোনো অঙ্কে সে শিশুর সরদার, কোনো অঙ্কে অন্য শিশু সরদারের সাগরেদ সে, কোনো অঙ্কে সে ক্রীড়া জগতের সেরা খেলোয়াড়, কোনো অঙ্কে পরিদর্শক মাত্র; কোনো অঙ্কে সে ছাত্র, কোথাও শিক্ষক, কোথাও যাত্রী, কোথাও চালক, কোথাও সুনাগরিক, কোথাও 'এজিটেটর', কোথাও বিবাহের আসরে বরযাত্রী,

কোথাও ঘটক আবার কোথাও নিজেই বর ; কোথাও সন্তান, কোথাও নাগর, কোথাও পতি, কোথাও কোথাও মহল্লা সরদার আবার কোথাও তাবেদার। একটি মানুষের জীবনে কত অগণিতভাবে যে তাকে চলতে হয়, তার সংক্ষিপ্ততম তালিকা এটুকু। জীবনের বিভিন্ন খাতে চলার পথে তার প্রধান পাথেয়ই হলো বাগধ্বনি। সমাজ-জীবনের এক এক পর্যায়ের অভিনয় কালে তাকে এক এক রকম ভাষা প্রয়োগ করতে হয়। একে অন্যের সঙ্গে সমাজ-জীবনে যে অঙ্কের অভিনয় করে, সেই অভিনয় বিশেষের জন্যে পরস্পরের একই রকমের বিশেষ ভাষার দরকার হয়।

একে অপরকে লক্ষ্য ক'রে যে-কথা বলে, শ্রোতাকে সেই কথারই প্রত্যুত্তর দিতে হয়। প্রতিক্রিয়ার নিয়মানুসারে ভাষা ব্যবহারে বক্তা ও শ্রোতার যথেচ্ছ ক্ষমতা সমাজ-জীবনের এক এক অঙ্কের অভিনয় কালে এমনি ভাবে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। গ্রাম্য প্রবাদের কথা মনে পড়ছে : 'চোরের মন বোচকার দিকে।' অন্য সময়ে অন্য দিকে যেতে পারে, কিন্তু বোচকা সামনে পড়লে আর অন্যদিকে কাঁহাতক যায়? তেমনি 'ঠাকুর ঘরে কে রে?' এ প্রশ্নের উত্তরে ভয় ভীত কোনো বালক (বালিকাও হ'তে পারে) যদি বলে, 'আমি কলা খাইনি তো?' তা হ'লে পারিপার্শ্বিক অন্য লোকের হাসির উদ্রেক হয় না কি?

ভাষা শুধু চিন্তাই প্রকাশ করে না, চিন্তা গোপনও করে। কূটনৈতিক জাতি হিসেবে ইংরেজ জাতির জগৎজোড়া খ্যাতি আছে। সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে কত জাতির সংগে কত ভাবে তা'কে ভাষার ব্যবহার করতে হয়েছে। শুধু মুখের ভাষাই নয়, হাত ও চোখের ভাষাও। সে-ভাষার অন্তর্নিহিত গোপন তত্ত্বটুকুর উদ্ধারে কত আইন বিশারদ নানা ভাবে হিম্‌সিম্ খেয়ে যায়নি কি? ছেলে বেলায় স্কুল ও পাঠশালা থেকে পালানোর ওজুহাতে সুবোধ মাষ্টারকে 'স্যার, পেট কামড়াচ্ছে' বলে ফাঁকি দেয়নি বাংলা দেশে এমন সুবোধ ছেলে খুব কম পাওয়া যাবে নাকি?

তরুণ বয়সে কোনো তরুণী সুন্দরীর মন পাবার এবং আরও কিছু বেশী সময় তার সঙ্গ সুখ লাভ করার জন্যে নিতান্ত গরজের কথা, পরস্পরের মা বাবার কথা পাড়ে না, পড়াশুনোর ছুতো ক'রে বই পুস্তকের হদিস নেয় না, এমন নেকবখ্‌ত্‌ আত্মভোলা ছেলে শতকরা ক'টা পাওয়া যায়?

অতএব দেখা যাচ্ছে চিন্তাশীল ও জ্ঞানী, গুণী লোকের অধ্যাপক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি সাহিত্যিক ও বক্তার বাহন হিসেবে ভাষা যত না চিন্তার প্রকাশ করে, তার চেয়ে বেশী একটি সমাজ ও জাতির সকলের জীবনে সকাল সন্ধ্যায়, দিনে-রাত্রে, আহারে বিহারে, আপিস আদালতে, স্কুল কলেজে, হাটে ও মাঠে নানা ভাবে তাদের কাজ ক'রে দেয়। ভাষা সমাজ-মানুষের হাতে আলাদীনের প্রদীপের মতো। যদি শক্তি থাকে তাকে দিয়ে যা খুশী, যেমন খুশী কাজ করিয়ে নেও, সে তোমার তাবেদার। কোনো কালে কোনো দেশে চিন্তায় সকলের অধিকার দেখা যায়নি; কিন্তু কথা বলায় এবং ভাষা ব্যবহারে সকলেরই সমান অধিকার। এ অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হ'লে স্বভাবতই সমাজ জীবন থেকে তাকে খারিজ হ'তে হবে; জান্তব-জীবন চল্‌লেও সমাজ-জীবনের পথ স্বভাবতই রুদ্ধ হয়ে যাবে।

ভাষা নর-জীবনে খোদার অপরিসীম শক্তিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ দান। অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে এই ভাষারই সাহায্যে। ভাষা ব্যবহারে খোদার উপর খোদকারী করছে খোদার সন্তানেরা। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এ-ভাষাই সম্ভব ক'রে তুলছে। ক্ষেত্র বুঝে উপযুক্ত ভাষার প্রয়োগ করো—জীবনের যে-কোনো অঙ্কে সার্থকতা অবশ্যম্ভাবী। অপাত্রে ভাষার আরোপ করো—উলুবনে মুক্তা ছড়ানোরই সামিল হবে।

সমাজ-বদ্ধ মানুষকে দল-বদ্ধ পশুর কিংবা automaton-এর সামিল ক'রে ফেল্‌লাম দেখে ভাষা সম্বন্ধে এমন কথা শুনতে অনভ্যস্ত সাহিত্যিক বন্ধুরা স্বভাবতই আমার উপরে ক্ষুব্ধ হবেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্বনি ও

ভাষাতত্ত্বের সবক নেবার সময় আমিও এসব কথা শুনে বিচলিত হয়ে উঠি। তখন মনে হয়েছিল এতকাল সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতে গিয়ে যা' শিখেছি ও শিখিয়েছি তা কি সব ভুল? ভাষা সম্বন্ধে এ চিন্তা পদ্ধতির পক্ষে প্রথম বছরখানিক আমার মন কিছুতেই সাড়া দেয়নি। তারপর যতই পড়েছি ও ভেবেছি ততই দেখি এ চিন্তা পদ্ধতিও একটি শক্ত ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। ভাষাকে সমাজ-জীবনের ভিত্তি রচনার মূল সহায় হিসেবে ধরলে এ চিন্তা পদ্ধতির একটা সহজ মীমাংসা পাওয়া যায়।

মানুষ জীবেরই সামিল। সমাজ-জীবনের বিশেষ পরিস্থিতিতে কথক ও শ্রোতার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে যে অর্থপূর্ণ ধ্বনি তাদের মুখ দিয়ে নির্গত হয়, দার্শনিকদের mechanist চিন্তা পদ্ধতির দিক থেকে তা-ই ভাষা। এ দর্শনের সার কথা চিন্তা ও আবেগের বাহক হিসেবে ভাষা পঠিতব্য হওয়া উচিত নয়। ভাষা ক্ষেত্র বিশেষে নির্গত অর্থপূর্ণ ধ্বনি মাত্র। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের বাকযন্ত্র ও মুখ বিবর নির্গত ধ্বনির রূপ, রকম ও ভংগী অসংখ্য; পশুর মুখনিস্থত ধ্বনির এবং তার প্রকার ভেদের সংখ্যা অল্প। মানুষ ও পশুর ধ্বনির মধ্যে তফাৎ তথা ভাষাগত দিক থেকে মানুষে ও জন্তুতে তফাৎ সেখানেই। এক একটি পরিবেশে মানুষ শুধু স্বর-যন্ত্র ও মুখবিবর দিয়ে কথাই বলে না, তার দেহের সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় নিয়োজিত করে। ধ্বনি-সংক্রমনে শুধু ভাষারই সৃষ্টি হয় না, তার সমস্ত শরীরই তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে।

সমাজ সম্বন্ধ নিরূপণে ভাষা কি ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং অধুনাতন দৃষ্টি-ভংগীতে কি ভাবে ভাষার বিশ্লেষণ হয়, এবারে তার কিছু উদাহরণ দিই। কোনো শব্দই এক অর্থে একের অধিক প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় না; সুতরাং কোনো শব্দের নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই। আমি অবশ্য আভিধানিক অর্থের কথা বলছিনা; কেননা অভিধানে প্রত্যেক শব্দেরই অর্থ আছে। আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকের কাছেও অভিধানের মূল্য অপরিসীম। সাধারণের

কাছে যে অর্থে অপরিসীম সে অর্থে অবশ্য নয়। Contrast বা বৈপরীত্যের জন্য ধ্বনিগত দিক থেকে শব্দের বিচারে ভাষাতাত্ত্বিকের কাছে অভিধানের মূল্য আছে, অর্থগত দিক থেকে নয়।

এ-যুগের ভাষা বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ধ্বনিগত বৈপরীত্য তো দূরের কথা, ধ্বনিগত সাম্য থাকলেও ক্ষেত্র ও পরিবেশ বিশেষে শব্দের অর্থ আলাদা হয়ে যায়। যেমন ধরুন 'হাত' ও 'নাক' শব্দ দুইটি। অভিধানগত অর্থ 'হাত'—'হাত'ই—'নাক' নয়। ক্ষেত্র বিশেষে এক হাতের কত অর্থ হয় দেখুন? 'আমার হাত নেই'—এই বাক্যটিতে অংশগ্রহণকারী দু'টো মানুষের কতকগুলো সমাজ পরিবেশ কল্পনা করুন। এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে (১) সম বয়সের দুই বন্ধু (২) দম্পতি যুগল (৩) গুরু-শিষ্য (৪) মুনিব-ভৃত্য ইত্যাদি। এই তিনটি শব্দের একটি বাক্যে কোনো শব্দের ওপরে শ্বাসযন্ত্রের চাপ বৃদ্ধি করায় কিংবা কোনো শব্দের স্বর-ধ্বনি দীর্ঘায়িত করায় ছন্দস্পন্দ বা intonation-এর রদবদলে আলোচ্য হাত শব্দটির অর্থ প্রতিবারেই কি ভাবে বদলে যেতে পারে তাই দেখছি। বাক্য শেষের সাধারণ পড়ন্ত স্বর-ভংগী দিয়ে পড়ুন:

'তোমার হাত নেই' — — — ↘

এখানে 'হাত' শব্দের অর্থ তোমার কোনো ক্ষমতা নেই। জিজ্ঞাসা সূচক বাক-ভংগীর বাক্য শেষের উঠন্ত স্বর-ভংগী দিয়ে পড়ুন: তোমার হাত — — — ↗ নেই? এখানে কোন কারণে হাত কাটা পড়ার জন্যেই হোক কিংবা কোনো কাজে তার ক্ষমতা না থাকার জন্যেই হোক, প্রশ্নকর্তার দিক থেকে প্রশ্নকৃত ব্যক্তিটির হাত না থাকার জন্যে একটা আশ্চর্যজনকতা প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং এখানে হাত শব্দটির অর্থ 'হাত' এবং ক্ষমতা দুই-ই। আবার স্বর-ভংগীর যে পর্যায়ে 'তোমার' শুরু হয়েছে, তা থেকে সামান্য কিছু উঁচু থেকে 'হাত' শুরু ক'রে স্বর-ভংগী নীচুতে আনুন এবং 'নেই' উচ্চারণে স্বর-ভংগী আরও নীচুতে ফেলুন 'তোমার হাত

নেই! — — এই বাচনভংগীতে 'হাত' শব্দের অর্থ 'হাত' এবং ক্ষমতা দুই-ই হতে পারে, কিন্তু বিশেষ সমাজ পরিবেশের যে context-এ কথক শ্রোতাকে লক্ষ্য ক'রে এই বাচন ভংগী এনেছে তার অর্থ 'হাত' এবং 'ক্ষমতা' যেমনই হোক না কেন, শ্রোতার অসহায়তাকে লক্ষ্য ক'রে কথকের অন্তর্লীন একটা বেদনার সুরই যেন ধ্বনিত হচ্ছে। এই বাক্যটির বিভিন্ন বাচন ভংগীতে 'হাত'-এর ধ্বনিগত নানা পরিবর্তন হ'লেও এক হাতের সঙ্গে অন্য হাতের অনেকটা সাম্যই লক্ষ্য করা যাবে। তবু একথা সত্য যে, প্রত্যেকটি social context-এ 'হাত' যে ভাবে উচ্চারিত হবে, তা-ই হাতের অর্থ এবং 'হাত' শব্দের নূতনত্ব ধার্য ক'রে দেবে। 'তার নাক নেই।' এই বাক্যটিকে নিয়েও সমাজ-পরিবেশ এবং সেই পরিবেশে কথা বলায় অংশ গ্রহণকারীদের বাচনভংগী থেকে 'নাক' শব্দটির নানা অর্থ এবং নাক তত্ত্ব উদ্ধার করা যেতে পারে।

সমাজ সম্বন্ধ চালু রাখতে গিয়ে পরিবেশ বিশেষে মানুষ যে ভাষার প্রয়োগ করে, তার unit হচ্ছে বাক্য, শব্দ নয়। সুতরাং একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেও তার আভিধানিক অর্থ সেখানে থাকে না। সমাজ-জীবনের কোনো একটি ক্ষুদ্র একাঙ্কিকা অভিনয় কালে তাতে অংশগ্রহণকারীদের ঘটনা সন্নিধান ও পরিবেশের পূর্বাপর সামঞ্জস্য বিধান করে ঐ একটি মাত্র শব্দ। সুতরাং ঐএকটি শব্দই একটি পূর্ণ বাক্য। মনে করুন, কোনো এক ঘরে দু'টা প্রাণী কথোপকথনে লিপ্ত আছে। আপনি তার পাশ দিয়ে যেতে লেগে তাদের কারুর কণ্ঠ-নিঃসৃত 'বটে!'—এই একটী শব্দ শুনে ফেললেন। তাতে যে বাচনভংগী জড়িত ছিল, তা থেকে বিশেষ তথ্য উদ্ধার করা যেতে পারে। 'বটে' একটী মাত্র শব্দ হ'লেও এবং ব্যাকরণ মতে তার 'পদ' বিশেষ এক নাম থাকলেও দু'টী মানবের সমাজ জীবনাভিনয়ের একটী অংশ ঐ একটী মাত্র কথা থেকে টেনে তোলা যাবে।

প্রাচীন বৈয়াকরণদের মতে, বাক্য নির্ধারণের ব্যাপারে উদ্দেশ্য ও

বিধেয়ের সর্তাবলীর আর প্রয়োজন নেই। জীবন্ত মানুষের সক্রিয় সমাজ জীবনের পটভূমিতে একটা শব্দও যে বাক্য হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞান ভাষার মূল্য নিরূপণে মানুষের সেই জীবনালেখ্য চিত্রিত করতে চায়।

ভাষাই মানুষের সমাজ-জীবন স্থির করছে; সম্বন্ধ পাতানো, সম্বন্ধের লালন ও বৃদ্ধি এবং সমাজ-জীবনের দৈনন্দিন নানা কায়কারবার সম্ভব হচ্ছে ভাষার মাধ্যমে। কোনো এক সমাজের পরিবেশ বিশেষ থেকে ভাষাকে এমনভাবে abstract বা আলগা করতে পারলে দেখা যাবে ভাষা যত না চিন্তার বাহন তারও চেয়ে বেশী মানুষের সমাজ-জীবন রচনার একমাত্র সহায়ক।

মাহে নও,
আগষ্ট ১৯৫৩।

আমাদের ভাষা ও সাহিত্য

সারা পাকিস্তানে কেন, পূর্ব্ব পাকিস্তানেও উর্দুই হবে এখানকার প্রাদেশিক সরকারের ভাষা এ প্রচেষ্টা পূর্ব বাংলার মাটিতে সফল হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা—এ ধারণা অনেকেরই ছিল এবং এখনও আছে। সে যা হোক—বহু রক্তাক্ত সংগ্রামের পর সম্প্রতি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন সভায় পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক ভাষা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ভাষা বাংলাকে উর্দুর সংগে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেবার কথা ঘোষিত হয়েছে। বিশ বছর পর ইংরেজীর বদলে বাংলা ও উর্দু সমভাবেই রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হবে। আর এ বিশ বছর ধরে বাংলা সহ আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলবার সাধনা চলবে।

সময়ের দিক থেকে বিশ বছর কম নয়। এর মধ্যে দেশের চেহারায় এবং মানুষের মনে নানা পরিবর্তন হ'তে পারে। পশ্চিম-পাকিস্তানীদের বিশেষ ক'রে পাঞ্জাবীরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যে তীব্র বিরোধিতা ক'রে এসেছেন এবং এখনও করছেন তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে আমাদেরই দেশের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা মতামত।

বাঙালী মুসলমানের ভাষা বাংলা হওয়া উচিত কিনা এবং হলে তার রূপ কি হবে? আরবী পারসী মেশানো, সংস্কৃত প্রভাবান্বিত না এ কালের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু বাংলা মেশানো খিঁচুড়ি ভাষা? আর তার সাহিত্যই বা কি হবে? ইসলামী? না পশ্চিম-বাংলা ঘেষা? না বাংলার 'মাটীতে বাঙালী-ইসলামী,' না অন্য কিছু? এ নিয়ে পাকিস্তান হবার পর থেকেই তর্ক চলে আসছে। এ তর্ককে কেন্দ্র ক'রে সাহিত্যিকদের মধ্যে যেমন কাদা ছুড়াছুড়ি হয়েছে তেমন পানিও কম ঘোলা হয়নি।

(পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রয়োজনেই এ সমস্যার উদ্ভব নয়, মুসলিম বাংলার এ প্রায় সুদীর্ঘ সাতশ বছরের সমস্যা ; বর্তমান রাজনৈতিক তাগিদে নতুন করে মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠেছে।

সুতরাং আমাদের মধ্যে একদল ভাবছেন বাংলা ভাষাকে একেবারে বাদ দিয়ে উর্দুকে বরণ করা যখন সম্ভব হলোনা তখন প্রচুর আরবী ফারসী তথা উর্দু শব্দ আমদানি করে, বাংলার বর্ণমালা পর্যন্ত পাল্টে দিয়ে বাংলাকে ধীরে ধীরে উর্দুর সমপর্যায়ে টেনে তুলতে হবে। এঁরা হলেন চরম পন্থী। নরমপন্থীরা মনে করেন বড় রকমের রাজনৈতিক বিবর্তন প্রতি দেশেরই জাতীয় জীবনে একটা পরিবর্তন এনে দেয়। তাই আমরা যখন পাকিস্তান অর্জনে সফলকাম হয়েছি তখন পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ বাংলাভাষা ও সাহিত্যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তার জন্য আস্ফালনের প্রয়োজন নেই, ভাষাকে আজই ঢেলে সাজাবার তাগিদ নেই আর বাংলা বর্ণমালাকে গঙ্গা পার করে পশ্চিম বাংলার 'কুফরস্তানে' ঠেলে দিয়ে হুরুফুল কোরাণের ভাওতায় উর্দু অক্ষর গ্রহন করারও 'জরুরাত' নেই। পাকিস্তান রাষ্ট্রের উন্নতির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যও ধীরে ধীরে পাকিস্তানী (পূর্ব পাকিস্তানী অবশ্য) ছাপ বহন করবে।

নরমপন্থীরা উগ্রপন্থীদের মত গ্রহণ করতে পারছেন না ; তবে পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁদের উদ্দেশ্য যে সাধু সে জন্য তাঁদের বুদ্ধির তারিফ করছেন। তাঁদের মত গ্রহণ করলে অনতিদূর ভবিষ্যতে আমাদের কি বদহাল হবে সে কথা ভেবে তাঁরা বলছেন এতবড় একটা 'Experiment' করতে গিয়ে কমপক্ষে বিশ কি পচিশ বছর কাটবে ; তাতে বাংলার কুলধর্মও ঠিক থাকবেনা আমাদের ভাষাও উর্দু হবেনা। এক কিম্ভূৎকিমাকার মিশ্রনোৎপন্ন ভাষার না গঠিত হবে আমাদের সত্যিকার সাহিত্য না পাবো আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা। এই প্রয়োগ পরীক্ষার বিফলতায় আমাদের জাতির (বাঙালী মুসলিম) মনে গভীর নৈরাশ্য দেখা দেবে। আর রাজনৈতিক

অবস্থার জন্যই ভেতরে ভেতরে উর্দুটাও আমাদের গা সওয়া হয়ে উঠবে তখন একদিন আইনের জোরেই হোক কিংবা মানসিক বিকারের ফলেই হোক উর্দুকে শুধু জীবিকা অর্জনের ভাষা রূপে নয়, আমাদের কথ্য লেখ্য, শিক্ষার মাধ্যম ও সাহিত্যের ভাষারূপে উৎসব ক'রে বরণ করে নেওয়া হবে। তারপর পূর্ববাংলায় চলবে উর্দুর সাধনা। এখানকার মুসলমানের মাতৃভাষা কি তামাদ্দুনিক ভাষা উর্দু নয় ব'লেই সেখানেও সুফল ফলবেনা; অথচ এত বছরে পশ্চিম পাকিস্তান যাবে শিক্ষা-দীক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহুদূরে এগিয়ে। আমরা হবো তখন ওদের বোঝা স্বরূপ, হবো অশ্রদ্ধার পাত্র। দু-নৌকয় পা দিয়ে সে অবস্থায় আমাদের বাঁচা তো দূরের কথা, শান্তিতে মরবারও আর ফুরসৎ থাকবে না।

প্রথমে যা বলছিলাম। (আজকের পাকিস্তান ও তার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বপাকিস্তান আর মধ্য যুগের মুসলমান আমলের সারা ভারতবর্ষের বাদশাই, আর সেই পটভূমিতে অখণ্ড বঙ্গদেশ।) সেদিনও বাঙালী মুসলমানের সামনে সমস্যা ছিল—তার ভাষাই বা কি আর কোন্ ভাষাতেই বা সে সাহিত্য রচনা করবে! (সেদিনও এদেশবাসী অথচ বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে এমনি দুই দল ছিল। এক দল বাংলা বর্জন ক'রে কি জানি কোন্ মুসলমানী ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে চেয়েছিল। তারাও আজকের দিনের উগ্র-পন্থীদের মতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সেবী নরমপন্থীদের বিদ্রূপ করতে ছাড়েনি আর বাংলাভাষা ও সাহিত্যকেও আপনার ব'লে গ্রহণ করেনি। মনে হয় এ ধরনের এক অশান্ত পরিবেশের মধ্যে পড়েই আজকের নরমপন্থী-দের মতো ষোড়শ শতকের বাঙলী মুসলমান কবি সৈয়দ সুলতান তাঁর 'রসুল বিজয়' কাব্যের ভূমিকায় অতি দুঃখের সংগে লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন—

> কত দেশে কত ভাসে কোরানের কতা।
> দিন মোহম্মদী বুজি দেয়ন্ত বেবস্তা॥

কর্ম্মদোষে বঙ্গেতে বঙালী উৎপন।
না বুজে বাঙালী সবে আরবী বচন ॥

* * *

বঙ্গদেসি সকলেরে কিরূপে বুজাইব।
বাঙালী আরব ভাষায় বুজাইতে নারিব ॥
জারে জেই ভাসে প্রভু করিছে স্বজন।
সেই ভাস তাহার অমূল্য সেই ধন ॥

কতকাল আগেকার কবির এই উক্তি ; অথচ শেষের দুই পংক্তির মর্ম আজই যেন বিশেষভাবে আমাদের উপলব্ধি করতে হচ্ছে। এরই সংগে বিচার্য অসংখ্য মোল্লা মৌলবী অধ্যুষিত নোয়াখালী জেলার সন্দীপ নামক সাধুরাম পল্লীনিবাসী সপ্তদশ- শতাব্দীর মুসলমান কবি আবদুল হাকিমের ক্ষমাহীন সতর্ক উক্তি। ক্ষোভে ও দুঃখে তিনি লিখেছিলেন—

যে সবে বঙ্গেতে জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি ॥
মাতা-পিতামহ-ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশীভাষা উপদেশ মনে হিত অতি ॥
দেশীভাষা বিদ্যা যার মনে না যুড়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায় ॥

(তিন শ' বছর আগেকার মুসলমান-যুগের নামে মাত্র দিল্লীর অধীন একরকম স্বাধীন বাঙলার মুসলমান আর আজকের আমাদের বহু-বাঞ্ছিত পাকিস্তানের করাচীর শাঁধনপুষ্ট পূর্ববঙ্গের মুসলমান।) বহুশত বৎসরের ব্যবধানেও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে বাঙালী মুসলমানের মানসিকতার কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে কি ? আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের অদূর-দর্শিতার জন্য এ যুগের মুসলমান আমরা কৃপা ছাড়া তাঁদের আর কি করতে পারি ? এখনও যদি আমরা এ অনাবশ্যক কলহকোন্দল বন্ধ ক'রে

আমাদের আপন সাহিত্য সৃষ্টি করতে মন না দিই তাহ'লে আমাদেরই ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কি ঠিক একালের উর্দু বাংলার ঝগড়া ও তদজনিত সৃষ্টির বিফলতার কথা স্মরণ ক'রে আমাদের দিক থেকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে না?

(বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা ক'রলে দেখি মুসলমানের পক্ষে বাংলা সাহিত্য সেবা করার বাধা ছিল যথেষ্ট; সে বাধা তার আপন রাজশক্তির দিক থেকে আসেনি—এসেছে তার সমাজের উগ্রপন্থী অদুরদর্শীদের কাছ থেকে। তবু দেখা যায় সমগ্র মধ্যযুগ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সাতশ' বছর ধরে বাঙালী মুসলমান বাংলা ভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টি করেছে। ভাল হোক, মন্দ হোক তার সেই সাহিত্যের মধ্যেই মুসলমানের চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের ছাপ সে ধরে রাখতে পেরেছে। মুসলমানের 'জঙ্গনামা'; তার 'কাসাসোল আম্বিয়া' 'মারফতি গান' এবং 'পদ্মাবতী' কি 'লোরচন্দ্রানী' এবং সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ পুঁথি সাহিত্য মুসলমানী ভাবধারা ও জীবনাদর্শ আজও বহন করছে। সত্য কথা বলতে কি পুঁথি সাহিত্যকে আমরা আজ যে দৃষ্টিতেই দেখিনা কেন বাঙলার মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলো যেমন বাঙালী হিন্দুর জীবন পিপাসা মিটিয়েছিল তেমনি মুসলমানের পুঁথি সাহিত্যও মুসলিম জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করে মহাকাব্যোচিত গৌরব নিয়েই তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এযুগের দৃষ্টি ভঙ্গীতে বিচার করলে মানুষের জীবনের উপরে ভিত্তি লাভ করে দাঁড়ায়নি ব'লে যেমন পুঁথি সাহিত্যের তেমনি মঙ্গল কাব্যের মূল্য অবশ্য কমে আসবে কিন্তু একথা সত্য যে হিন্দুর যেমন পদাবলী সাহিত্য মুসলমানের মারফতী গান তেমনি হিন্দুর মঙ্গলকাব্যের পাশে একমাত্র এই বিরাট পুঁথি সাহিত্যের ভাণ্ডারই সেকালের বাঙালী মুসলমানকে সম্মান ও গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। সেকালের বাঙালী মুসলমান সৃষ্টি প্রতিভায় বাঙালী হিন্দুর তুলনায় কিছু কম ছিল না পুঁথি সাহিত্যই তার প্রমাণ।)

বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও বাঙলা দেশে ইংরেজ আগমনের পূর্বপর্যন্ত মুসলমানেরা যে ধারায় বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছে দেশের রাজশক্তি মুসলমানদের হাতে থাকার জন্য তার সবটা না হলেও অনেকটা বাঙালী হিন্দুও তার সাহিত্য সৃষ্টির জন্য গ্রহণ করেছে। মোটামুটি মুসলমানযুগে হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত বাংলা সাহিত্যে যে মুসলমান প্রভাব দেখি ঐতিহাসিকের বিচারে এদেশ ও জাতির অতীত নিরূপণ করতে তার মূল্য কিন্তু কম নয়। ✓

সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনে অত্যন্ত সুস্থ ও সহজ রাজনৈতিক চেতনা এবং সাম্য মৈত্রী ও প্রীতি জনিত ভাব ছড়িয়ে ইসলাম যেমন ভারতবর্ষের জাতিভেদ পীড়িত ও অত্যাচার জর্জরিত অগণিত মানুষকে আপন স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছে তেমনি এ দেশ তার জাতিধর্মকে বাঁচাতে গিয়ে রামানন্দ কবীর নানক এবং চৈতন্য প্রমুখ সাধক ও উদার মতাবলম্বী ও মধ্যপন্থীর জন্ম হিন্দুর জীবনে এও যেমন ইসলামের পরোক্ষ প্রভাব তেমনি বাঙালী জীবনেও বাঙলার হিন্দুমুসলিমের মিলিত সাহিত্যে চিন্তাধারার দিক দিয়ে সুফী প্রভাবও ইসলাম তথা মুসলমানের দান। এ দান পরোক্ষভাবে হলেও হিন্দুর বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে ছাড়েনি। এ ছাড়া বাংলায় উপাখ্যান কাব্যরচনা হিন্দুমুসলমানের ফারসী চর্চার সমসূত্রেই এদেশে এসেছে।

চিন্তাধারা বা ভাব জীবনের দিক থেকে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে মুসলমান প্রভাব যতটা আশা করা গেছিল অবশ্য ততটা হয়নি, কিন্তু হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে বাঙালীর ব্যবহারিক জীবনে মুসলমান প্রভাব যথেষ্টই বলতে হবে। বাঙালীর ঘরের আসবাব, তার পোষাক পরিচ্ছদ, তার বিলাসিতার উপকরণ, তার অসুখের এলাজ, তার বড়মানুষি খেলার সরঞ্জাম, মাসান্তের মাহিনা, গাড়ীঘোড়ায় চড়ার রেওয়াজ, তার তেজারত, জমি জমার বন্দোবস্ত, তার আদালতের মামলা মোকদ্দমা, তার পরিচায়ক পদ ও পদবী,

এমনকি তার দৈনন্দিন জীবনের জবানও বহুদিকে মুসলমান প্রভাব দ্বারা শাসিত। বাঙলার সাহিত্য তার এ নজীর আজও বহন করে চলেছে।

বৃটিশপূর্ব যুগের বাঙালী জীবন ও সাহিত্যে তো বটেই, ইংরেজী আমলের সাহিত্যেও মুসলমান প্রভাব কম নেই। সেকালের ভারতচন্দ্রের 'যাবনী মিশাল' ভাষা না হয় বাদই দিলাম, উনবিংশ শতাব্দীর গঠন যুগের লেখক প্যারিচাদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল এবং হুতোমপ্যাচার নক্সা পড়তে গিয়ে আরবী ফারসী শব্দের যথেষ্ট ছড়াছড়ি দেখা যায়। আলালের প্রায় প্রতি পংক্তিতেই আরবী ফারসী শব্দের এত অধিক ভিড় রয়েছে যে আজকালকার ভাল আরবী ফারসী জানা লোকেরও পিলে চমকে ওঠে। অতদূরে কি, এহেন যে বঙ্কিম তার মতো লেখকের রচনাতেও ফারসি ও তার সমসূত্রে আরবী শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দু অবশ্য তার নিজের দৃষ্টি দিয়েই এ যুগে মুসলমানের জন্যও সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছে। (হিন্দু গিরীশচন্দ্র কোরান শরীফের ও হাদিস শরীফের প্রথম অনুবাদক, হযরত মোহম্মদের প্রথম জীবনী লেখক; মুসলমান সাধকগণের প্রথম জীবনী প্রচারক। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সিরাজ ও মীরকাসিমের প্রথম কলঙ্ক মোচক। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার' রামপ্রাণ গুপ্ত ইসলামের ইতিহাস লেখক; সত্যেন দত্ত ও মোহিতলাল বাংলার মুসলিম কৃষ্টির রূপকার ও কবি। এ যুগের নামকরা মুসলমান লেখকদের মধ্যে মীর মোশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, লুৎফর রহমান' ইমদাদুল হক, কায়কোবাদ ও নজরুল বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জীবন ও তমদ্দুনের উদ্গাতা। এঁদের সৃষ্টি শুধু মাত্র মুসলমানদের জন্য হয়নি; মুসলিম কৃষ্টি ও জীবন থেকে রস সংগ্রহ ক'রে বাংলার মাটী ও সাহিত্যকে উর্ব্বর করেছে। তা হয়েছে বাংলার ও বাঙালীর।

বৃটিশ শাসনের মধ্যকালই বাংলা সাহিত্যের পরিণত কাল। সে সময়েও মুসলমান আমলের জের একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি; তার শেষ রশ্মিটুকু

ক্ষীণ দীপালোকের মতো নিবু নিবু করছে। একথা সত্য যে পলাসীর যুদ্ধে বাংলাদেশে মুসলিম রাজশক্তির ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটলে পুঁথি সাহিত্যের ভাষা বা অনুরূপ আরবী ফারসী প্রভাবান্বিত বাংলা ভাষাই হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর বাংলা সাহিত্যের ভাষা হতো এবং নবযুগের বাংলা সাহিত্যের এ হেন সমুন্নতরূপও অনুরূপ ভাষার উপর ভিত্তি করেই দাঁড়াতে পারত। কিন্তু সে কথা থাক্। অতীত ফিরে আসেনা ; অতীতকে আঁকড়ে ধরা কিংবা তাকেই যথাযথ ভাবে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টাও ফলবতী হয়না। তার জন্য দুঃখ ক'রে লাভ নেই ; কেবল দুঃখ হয় তাঁদের জন্য যাঁরা ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ না করে বর্ত্তমানকে সেই কঙ্কালসার অতীতেরই সেকেলে বোরকা পরাতে চাইছেন।

রাজনৈতিক কারণেই ইংরেজ শাসনে মুসলমান দেশের সকল বিধি ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে গেল। আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে পড়ে শিক্ষাদীক্ষা থেকেও বঞ্চিত হল। সুতরাং এ মহা নরাণ্যের মধ্যে সে আর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি করবে কি করে ? ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত এ যুগ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও স্বর্ণ যুগ। এ যুগের বাংলা সাহিত্য মূলত বাঙালী হিন্দুর সৃষ্টি। তার পাশে মুসলমান রচিত সাহিত্য একটা ক্ষীণ দীপালোকের মতোই মিট্ মিট্ করছে। সুতরাং হিন্দুর রচিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিন্দু কৃষ্টিরই যে ছাপ বহন করবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। হিন্দু কৃষ্টি বাদ দিয়ে যে পরিমাণে তা মানুষের অন্তর্জীবনের গাথা রচনা করেছে সে পরিমাণে তা বাঙালীর সুতরাং মুসলমানেরও এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। সে দিক থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বাঙালী মুসলমানও সে সাহিত্যের একটা বিরাট অংশের দাবীদার একথা অস্বীকার করলে চলবে কেমন করে ?

তাই ব'লে তার নিজের সাহিত্য তাকে সৃষ্টি করতে হবে না এবং বাংলা সাহিত্যের বিশ্ববিমোহনরূপে মোহ গিয়ে মুসলমান সান্ত্বনা পাবে এও

তার পক্ষে এক মস্ত বড়ো বিড়ম্বনা। যেমন ক'রে সে হিন্দুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মধ্য যুগের সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছে হিন্দুর তুলনায় নগণ্য হলেও বাংলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বলযুগে তার কৃষ্টির ছাপ যেমন ক'রে সে তার নিজের রচিত সাহিত্যে স্থল বিশেষে ফুটিয়ে তুলেছে আজকের রাষ্ট্র ব্যবস্থার এ মহাপরিবর্তনের যুগেও সে তেমনি তার সাহিত্য রচনা করবে। সে সাহিত্য হবে বাংলা, তার ভাষাও বাংলা এবং লিপিও বাংলা।

(পশ্চিম বাঙলা ও পূর্ববাঙলা এ-দুটো কথা নূতন নয়; নূতন শুধু হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এ পরিবর্তন আসার বহুপূর্বথেকেই অর্থাৎ দেশ ও সাহিত্যের শৈশবাবস্থা থেকেই বাঙলা দেশের এই দুই অঞ্চলের আবহাওয়াতে তফাৎ ছিল। উক্ত ভৌগলিক পার্থক্য এমনি যে তা আপনাপন অঞ্চলের মানুষের জীবনের সকল দিকেই বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের অজস্র ছাপ রেখে গেছে। আবহমান কালের 'বাঙ্গাল' ও ঘটীর লড়াই ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কথা না হয় বাদই দিলাম—দুই বাঙলার সাহিত্যে যদিও বা এর প্রকাশ কম হয়নি। কিন্তু নদীমাতৃক পূর্ববাঙলার অপেক্ষাকৃত সিক্ত মাটীতে এ অঞ্চলের মানুষ ভাটিয়ালী, মারফতী, জারি মাসিয়া, লোক সঙ্গীত ও পল্লীগীতিকা ইত্যাদির যেভাবে জন্ম দিয়েছে তা নিছক পূর্ব বাঙলারই। আশ্চর্যের কথা এই যে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলিম জীবনের অন্তর্গাথা এবং দরিদ্র ও নিরক্ষর মুসলিম জীবনকে কেন্দ্র করেই প্রাণ পেয়েছে। আবার শুকনো মাটীর দেশ পশ্চিম বাঙলায় যে সাহিত্য ফলেছে উক্ত অঞ্চলের প্রাকৃতিক শুষ্কতার জন্যই বোধ হয় (অবশ্য বৈষ্ণব কবিতা বাদ দিয়ে) তার মধ্যে জলীয় ভাবের অংশ অপেক্ষাকৃত অল্প। এর সূক্ষ্ম উদাহরণ পশ্চিমের বাউল সঙ্গীত আর পূর্ব বাঙলার ভাটিয়ালী।) প্রাণের আবেগ দুটোতেই সমান তবু বাউলে চড়াই, ভাটিয়ালীতে উৎরাই। শুষ্ক ও রুক্ষতার জন্য বাউলে ঊর্দ্ধশ্বাস আর প্রচুর জলীয় বাষ্পের জন্য ভাটিয়ালীতে শ্বাস নিম্নগামী; একটা পশ্চিম বাঙলার আর একটা পূর্বের।

একটা হিন্দুর, একটা মুসলমানের। একি আজকের তফাৎ? এতো চিরকালের!

পাকিস্তানের নবতন আলোকে আমাদের সাহিত্যকে শুধু এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলেই যথেষ্ট হবে না। কথা উঠেছে সাহিত্যকেও দীন ইসলামের কালেমা পড়াতে হবে। কথাটি বিচার ক'রে দেখা যাক্। পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হোক বা না হোক পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীই যখন মুসলমান তখন তার জীবনে এবং সাহিত্যেও ইসলামের সুস্পষ্ট চাপ থাকতে বাধ্য। ইসলাম শুধু ধর্ম নয়; দুনিয়াতে মানুষের সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক ও সহজভাবে বেঁচে থাকবার ব্যবহার বিধি। উক্ত নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত থেকে যে জাত বাঁচতে চায় তার উপযোগী সাহিত্য তাকে তৈরী করতে হবে। কেননা সাহিত্যই জাতির সংস্কৃতি গ'ড়ে তোলে এবং সেই সংস্কৃতির দুগ্ধধারে সুস্পষ্ট ক'রে সে জাতিকেও বাঁচায়। পৃথিবীতে শারীরিক শক্তির আস্ফালনের দ্বারা কোন জাতি বাঁচেনি; কুওতে ইসলাম জাহির ক'রে আমরাও তেমন বাঁচতে পারবো না। জাতীয় জীবনের উত্থান ও পতন আছে স্বীকার করি কিন্তু এও মানতে হবে যে পতন থেকে অভ্যুদয়ের পথে এগুতে তার সাহিত্যই তাকে প্রেরণা দেয়; সাহিত্য জাতীয় জীবনের আরসি; সুতরাং যে জাতির সাহিত্য নাই তার আর রয়েছে কি?

প্রশ্ন হ'তে পারে মুসলমানের রচিত হ'লেই কি তা মুসলিম সাহিত্য হবে? তা যখন হয়নি এবং হবেও না তখন পূর্ববঙ্গের সাড়ে তিন কোটি মুসলমানের সাহিত্য আমাদেরই রচনা করতে হবে। কোরান হাদীস' ফেকা উসুল, শরাহ শরীয়ত মাফিক মুসলিম জীবন যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত তার সাহিত্যকেও তদনুবিদ্ধ প্রাণধর্মে উর্জ্জীবিত হ'তে হবে। হিন্দুর রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাণ ও গীতা উপনিষদ যেমন তার সাহিত্যের অফুরন্ত উৎসব হ'য়ে রয়েছে এবং হিন্দু যেমন অকাতরে সেখান থেকে ভাব সম্পদ আহরণ

ক'রে তার নব যুগের সাহিত্যকে একটা বিরাট মহনীয়তা দান করেছে আমাদের সাহিত্য সৌধও তেমনি কোরাণ ও মুসলমানী উপকথার বিরাট চত্বরের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রসঙ্গত বলা যায় মুসলমান সমাজের কোন নায়িকাকে যদি ফজর থেকে এশা পর্য্যন্ত শুধু নামাজই পড়তে দেখি তাতে বিস্মিত হবো না, কিন্তু সে যদি এবাদৎ বন্দেগী করতে করতে তার নারীত্ব বর্জন ক'রে ফেরেস্তা হ'য়ে দাঁড়ায়' তখন শুধু বিস্মিত নই, ব্যথিত হবো। অতএব আমাদের সাহিত্যের দেহ ও মন হবে মুসলমানের কিন্তু আত্মা হবে সকল কালেব সকল দেশের মানুষের ; এক কথায় সার্বজনীন, সুতরাং বিশ্বের।

এখানে একটা কথা আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে। আমাদের দেশ সেই পূর্ববঙ্গ আজকের পূর্ব পাকিস্তান ; মুক্ত মুসলমানের স্বাধীন আবাস ভূমি ; কিন্তু দেশের মাটী সেই পূর্বেরই, প্রকৃতি তাও সেই পুরাতন ; এখানকার মুসলমানের চেহারায় এদেশের প্রকৃতিগত ছাপ আমৃত্যু সংরক্ষিত। সুতরাং আমাদের অন্তর ও বহির্জীবনের উপর রাষ্ট্রগত প্রভাব আনতে হ'লে এদেশের মানুষগুলোর দিকে চেয়েই তা আনতে হবে নইলে শেষটায় আমরা মুসলমান তথা মানুষ গড়তে গিয়ে বানর না গড়ে ফেলি সে আশঙ্কাও আছে। বিপদ আমাদের কম নয়।

এ বিপদ থেকে একমাত্র আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যই আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে। আমরা পাকিস্তানবাসী অথচ পূর্ব পাকিস্তানের ; এই বৈশিষ্ট্যের উপরে যদি আমাদের সাহিত্য গড়ে ওঠে তবে আশা হয় আমরা মরবো না ; এবং কারুর দাসেও পরিণত হব না বরং নিখিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ণ সমৃদ্ধিতে আমাদের যথোপযুক্ত দান নিয়েই বিশ্বের দরবারে হাজির হ'তে পারবো। এপথে এগুতে হ'লে আমাদের সাহিত্যের ভাষা বাংলাই রাখতে হবে ; সেখানে প্রয়োজনাতিরিক্ত আমূল পরিবর্তনের জন্য বাহির কি ভেতর থেকে কোন জবরদস্তি চলবেনা। একথা অবশ্য

ঐতিহাসিক সত্য যে প্রত্যেক জাতির ভাষা ও সাহিত্য নানা কারণে যুগে যুগে নানা পরিবর্ত্তন দেখা গেছে কিন্তু সে পরিবর্তন দশ পাঁচ বছরে সম্ভব হয়নি ; ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই যে পরিবর্তন উদ্ভব হয়েছে খুব কম করে হলেও শতাব্দী কালের কম সময়ে জাতীয় জীবন ও সাহিত্যে সে পরিবর্তন হাড়ে মাংসে সঞ্চারিত হয়নি।

(পূর্ব পাকিস্তানের নব্য মুসলিম বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দুদের কথা। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও মানবতার আদর্শে দীক্ষিত হ'য়ে অফুরন্ত সৃষ্টি প্রেরণা নিয়ে বাঙালী হিন্দু সেদিন যে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে, হিন্দু পটভূমিকায় রচিত হলেও তা হয়েছে বাংলার ও বাঙালী সাহিত্য। পাকিস্তান মুসলমানের আশা ও ভরসার ঠাঁই, তার জীবনের বিচরণ ভূমি, মরনের বিশ্রামস্থল। যে মুক্ত জীবন কল্পনা মুসলমানকে পাকিস্তান রচনায় দুরন্ত উন্মত্ত ক'রে তুলেছিল প্রতিষ্ঠার নবতন আলোকে সৃষ্টি পাগল উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দুর মতোই মুক্তি পাগল আজকের এই বাঙালী মুসলমান জাতিও তেমনি তার বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করবে।) পাকিস্তান আন্দোলনের সমসাময়িক কাল থেকেই তার শুভ সূচনা হয়েছে। এ প্রয়োগ পরীক্ষার পথ ধরে আশা আছে আমাদের সাহিত্যেও ইসলামি ভাবধারার সঙ্গে যথারীতি ও গভীর পরিচয়-সম্পন্ন বাঙালী ইকবাল কি মুসলমান রবীন্দ্রনাথ, শরৎ ও তারাশঙ্করের শুভাগমন হবে। এ দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন সমস্যা নেই। সমস্যা যা, তা আমাদেরই। ভাষায় ও বর্ণমালায় বাংলা বর্জন করে উর্দু গ্রহণ করলে সে সমস্যার সমাধান হবেনা। (রাজভাষা ইংরেজি বরণ ও চর্চ্চা করে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দু যেমন বাংলা সাহিত্যে তার সৃষ্টির আনন্দ ধ'রে রেখেছে, ইসলামী ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত [ও আমাদের নব সাহিত্য সৃষ্টির জন্য আজকের রাষ্ট্রভাষা] উর্দুকেও আমাদের সেই ভাবে গ্রহণ করতে হবে। তার এক চুল বেশী হ'লেই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে

অনুকরণ করেও আমরা দাঁড়াতে পারবোনা, স্বীয় স্বাতন্ত্র্যের মহিমায়তো নয়ই। ইতিহাস তার প্রমাণ। এ বাস্তব সত্যকে যে অবহেলা বা অস্বীকার করে অপঘাতে সে জাতির মৃত্যু হয়। অতি আগ্রহ ও উগ্রতাও তখন তাকে বাঁচায় না।

যেমন ক'রেই হোক জীবনের আঘাতে জীবন জেগে ওঠে। যাঁরা মালিনীর ভাঙা মালঞ্চে একদিন যেমন সুন্দরের অতর্কিত আগমনে তা ফুলে ফলে ও সমৃদ্ধি-সৌরভে ভরে উঠেছিল তেমনি পাকিস্তানের সোনার কাঠির স্পর্শে বাঙালী মুসলমানের ঘুমন্ত অন্তরপুরীতে দোলা লেগেছে; সৃষ্টি প্রেরণায় সে আজ মশগুল। আজ তার ভুল করলে চলবে না। সে যে বাঙলার মানুষ। সুতরাং তার মুসলমানত্ব ও বাঙালীত্ব, তার পাকিস্তান ও পূর্ব বাঙলা—এই বৈশিষ্ট্যের উপরেই তার সাহিত্য তাকে রচনা করতে হবে।

দিলরুবা।

হিন্দু বাঙলার ধর্মান্দোলন ও উনবিংশ শতাব্দী

ভারতবর্ষ ধ্যানধারণা, যজ্ঞ সাধনা ও ধর্মের দেশ। সমগ্র ভারতবর্ষ কেবল এই ধর্মীয় ঐক্যেই অখণ্ড। ভারতের প্রতি প্রদেশে বহুকাল ধরিয়া বৈদিক সাধনার প্রাণরস প্রবাহিত হইতেছে। যুগে যুগে এবং প্রদেশবিশেষে ইহার বাহ্য রূপ বিভিন্ন হইলেও তাহার আত্মার ধারাটি এক এবং সনাতন। যুগরূপী রাক্ষসীর নির্ম্মম দন্তপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া সনাতনই এই ভারতবর্ষে আপনাকে বারংবার উজ্জীবিত করিয়াছে, ইতিহাসে তাহার নজীর মিলে। বিনা আঘাতে বীনার তার ধ্বনিত হয় না, আঘাত পাইয়া বিভিন্ন সুরে অনুরণিত হইলেও বীণার আকৃতিতে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তেমনি বৈদিক হিন্দুধর্ম বাহির হইতে যখনই কোন আঘাতের সম্মুখীন হইয়াছে তখনই সেই জাতীয় সঙ্কটের দিনে বিভিন্ন রূপে ও ভাবে আপনার চিরকালের সেই আদি ধারাকে সুপ্রকাশ করিয়াছে। হিন্দু ধর্ম একদিন এমনই এক মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছিল যখন ইসলাম তাহার গণতান্ত্রিক ভ্রাতৃত্বের উদার আদর্শ লইয়া এদেশে প্রবেশ করে। উক্ত প্রসঙ্গে অপরের হইলেও একটি কথা উল্লেখযোগ্য—'শঙ্করবেদান্তে যে বাইরের কোন প্রভাব রয়েছে, একথা অনেকেই হয়ত স্বীকার করতে চাইবেন না, অথচ সহজ একটি ঐতিহাসিক সত্যের বিচার করলে সে প্রভাব অস্বীকার করবারও উপায় নেই। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে প্রায় অষ্টম শতক পর্যন্ত হিন্দু ধর্ম-মতে যে সমস্ত পরিবর্তন, নতুন নতুন মতবাদের আবির্ভাব ও বিবর্তন, তার পরিচয় উত্তর ভারতের মধ্যেই আবদ্ধ। সংস্কৃতি ও সভ্যতা, প্রাচীন রীতি ও নতুন বিদ্রোহ সব কিছুরই পরাকাষ্ঠা উত্তর ভারতের জীবনে। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীতে অকস্মাৎ তা বদলে গিয়ে ভারতীয় চিন্তাধারার নেতৃত্ব দক্ষিণ ভারতে চলে গেল। শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বাদিত্য, বল্লভাচার্য্য, মাধব

সবাই দাক্ষিণাত্যের লোক—বৈষ্ণব এবং শৈব মতের উৎপত্তি, দ্বন্দ্ব এবং পরিণতি সেখানে। জাতির জীবনাবেগের এ পরিবর্তন অনেক ঐতিহাসিকের কাছেই বিস্ময়কর মনে হয়েছে, অথচ ভারতে ইসলামের আবির্ভাবের কথা মনে রাখলেই সহজেই তার রহস্য পরিষ্কার হয়ে উঠে। বিনকাসিমের সিন্ধু-বিজয়েরও পূর্বে সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই দক্ষিণ ভারতে মুসলমানদের আনাগোনা শুরু হোয়েছিল, তার ফলে মালাবারের চেরামন পেরুমল বংশের শেষ রাজা নিজে ইসলাম গ্রহণ করে আরব দেশে চলে যান। রাজার এ ধর্মান্তর সে যুগে দক্ষিণ ভারতে ইসলামের প্রভাবের একটি লক্ষণ। বিপরীতধর্মী দুই সংস্কৃতির সংঘর্ষে হিন্দুর সমাজমনে তার ধর্মবিশ্বাস ও জীবনদর্শনে যে সাড়া জাগলো, তারই ফলে বৈষ্ণব এবং শাক্ত মতবাদের উদ্ভব ও পরিণতি। উত্তর ভারতীয় প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস এবং জীবনদৃষ্টি মধ্যপন্থী, শান্ত এবং ভাবগম্ভীর। দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদে যে মনোবৃত্তির বিকাশ, আবেগের প্রাচুর্য্য এবং তীব্রতাই তার প্রধান লক্ষণ। উত্তর ভারতের শান্ত সমাহিত পরমত-সহিষ্ণু বুদ্ধি-প্রধান শিথিল মতবাদ অকস্মাৎ দক্ষিণ ভারতে আত্মকেন্দ্রচ্যুত আবেগের প্রাবল্যে বিপ্লবী হোয়ে উঠ্‌লো কেন, সে প্রশ্ন তুললে ইসলামের প্রভাবকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাই শঙ্করের মায়াবাদ এবং ব্রহ্মের ঐক্যস্থাপনের প্রচেষ্টার তীব্রতার মধ্যেও ইসলামের উন্মাদনা কার্য্যকরী—শঙ্করের জীবনের ইতিহাসেও তার আভাস খুঁজে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের ভক্তিবাদ এবং নব্যদর্শনের সূত্রগুলির প্রত্যেক-টিই হয়ত উপনিষদের মধ্যে মিলবে কিন্তু তাদের সামঞ্জস্যের যে ভঙ্গী তা প্রতিপদে ইসলামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।' (হুমায়ুন কবির, বাঙলার কাব্য পৃঃ-২৫।২৬)।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিক্রিয়ায় হয়ত সেদিন শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ দার্শনিকেরা ভারতীয় দর্শনের প্রয়োজনানুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বেদান্তভাষ্যে বৌদ্ধ ধর্মের অনুরূপ ও ব্যবহারিক জীবনে তদপেক্ষা সুপুষ্ট

ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব যে সেদিন কোন ক্রিয়া করে নাই এমন কথা ভাবিতে দ্বিধা হয়। কারণ, উপরি উক্ত ইতিহাসবর্ণিত সত্যের দিকে লক্ষ্য করিলে ভারতীয় জীবনদর্শনে ইসলামের ভাবী প্রভাব সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের মত বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি যে অবহিত হইয়াই বেদান্ত-ভাষ্যের নবতর রূপ দান করিয়া থাকিবেন, ইহা বিস্ময়কর হইলেও অসম্ভব নহে। তাই দেখি, সেদিনও ইসলামের মত নবোজ্জ্বল ও আদর্শপুষ্ট সংস্কৃতির সংঘাতে ভারতে সেই বৈদিক সনাতন ধর্মেরই শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ ভাষ্যকারদের দ্বারা নবতর ব্যাখ্যা হইয়াছিল এবং তাঁহাদের বুদ্ধিদীপ্তির চকিত ঝলকশেষে হৃদয়ের প্রেমধারা রামানন্দ প্রবর্তিত যুগে নানা শাখা পল্লবে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়া ছিল।

দ্বিতীয় বারের জন্য ভারতীয় হিন্দু ধর্ম সঙ্কটের সম্মুখীন হয় ইংরাজ-আগমনে। ইহার প্রতিক্রিয়া কি ভাবে ভারতেতিহাসের পৃষ্ঠাকে গৌরবোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দেখাইবার পূর্বে ভারতবাসী ও বিশেষত বাঙালীর ভাগ্যাকাশে যে অন্ধকার অমানিশা ও ঘোর দুর্দ্দিন ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস হইতে তাহার কিছু রেখা নির্দ্দেশের এখানে প্রয়োজন আছে।

পলাশীর যুদ্ধে বাঙালীর ভাগ্য বিপর্য্যয় হওয়ার পর জাতির রাষ্ট্র ও সামাজিক জীবনে একটা ঘন দুর্যোগ নামিয়া আসিয়াছিল। দেশীয় রাষ্ট্রের অবসান ও বিদেশী শক্তির পূর্ণ প্রতিষ্ঠার মাঝখানে যে অরাজকতা বিরাজ করিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ পর্যন্ত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে পাশ্চাত্য প্রভাব বহুদিক দিয়া অনুভূত হয়। বাংলাদেশ হইতে যেমন ইংরাজ রাজ্যের আরম্ভ বাংলাদেশেই তেমন পাশ্চাত্য প্রভাবের সূচনা। এই প্রভাব প্রধানতঃ খ্রীষ্টান পাদ্রিদের ধর্মপ্রচারের ভিতর দিয়া উন্মেষিত হয় এবং রাজ সরকারের বহুবিধ সংস্কার, শিক্ষা-ব্যবস্থা ও দেশ-

শাসন নিমিত্ত সদনুষ্ঠানের হিতৈষণার মধ্যে বিকাশ লাভ করে।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ফল কিন্তু ভালই ফলিয়াছিল। এ যুগের ইতিহাসে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকার শেষে যখন ভারতে এবং বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে ইংরাজ রাজ সরকারের সুপ্রভাত হইতেছিল তখন বাঙ্গলার শ্রীরামপুর হইতে মিশনারিদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও রাজকর্মীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, বাংলা ভাষার পথ সেই কেরী মার্শমান প্রমুখ পাদ্রিদের দ্বারা প্রশস্ত হইয়াছিল এবং সাধারণের মধ্যে বাইবেলের অনুবাদ প্রচার ও কলেজের বিবিধ শিক্ষা-বিষয়ক পুস্তকপ্রণয়নের ব্যপদেশে বাংলা গদ্যের পথ যতই সুগম হউক না কেন; সেদিনই বিপুল অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের বীজও অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল।

মিশনারীরা বেদনাক্লিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে বাংলা বাইবেল প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের আর্থিক জীবনের উন্নতির আশাসঞ্চার এবং অভাব-অনটন ও দৈব-দুর্বিপাকে সাহায্য প্রদানও করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা এমন বিরাট প্রলোভন হইতে তাই সেদিন আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই। একদিকে সমাজের নিম্ন-স্তরের লোকদের এই অবস্থা এবং অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে রাষ্ট্রের পরিবর্তন ও তাহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষার অভাবজনিত অজ্ঞতা। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়া সেদিনের বাঙালী তাহার ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রকৃষ্ট রূপ খুঁজিয়া না পাইয়া দিশাহারা হইয়া ফিরিয়াছে। সেদিনের স্বল্প-সংখ্যক সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালী পণ্ডিত পার্শ্ববর্তী মুসলিম সমাজের মৌলবীদের মত ধর্ম শাস্ত্রের খোলস লইয়া তোলপাড় করিয়া ফিরিয়াছেন কিন্তু যুগ ও জাতির প্রয়োজন অনুযায়ী ধর্ম ও শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিয়া যুগামৃত পরিবেশন করিতে পারেন নাই।

এমন দিনে সম্ভ্রান্ত রামমোহন বেদ, বেদান্ত, কোরআন ও বাইবেল

ছান্দ্য, বিভিন্ন ধর্মের অমৃতসার সংগ্রহ করিয়া, অপূর্ব বোধবুদ্ধি, মেধা ও ধীশক্তি সাহায্য যুগ ও জাতির চেতনা জন্মাইবার জন্য চিরপরিচিত ধর্ম-অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিলেন। মধ্যবিত্ত সমাজের ধর্মান্ধতা ও নিম্নশ্রেণীর বিদেশীয় ধর্মানুসরণের সম্মুখে সহজ সরল, অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরবর্জ্জিত, অনুভূতিসাপেক্ষ ব্রাহ্মধর্মের একমেবাদ্বিতীয়ম্ আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন) (ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে শ্রী চৈতন্যের ধর্মান্দোলনের পরে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম-স্বার্থ-সংরক্ষক আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিচয় অবশ্য পাওয়া যায় না। সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত দেশ ও জাতি যে অস্পৃশ্যতা, কঠোর জাতিভেদ, কন্যাহত্যা, বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রভৃতি অনাচারমূলক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল তাহারই ফলে এ দেশীয় হিন্দু ধর্ম ও সমাজদেহে ধর্মের নামে—বিশেষত তাহার আনুষ্ঠানিক রূপের মধ্যে—বহুবিধ আবর্জ্জনার সৃষ্টি হইয়াছিল; রামমোহনের সাধনায় তাহার সমাধান না হইলেও তিনিই যে এতকাল পরে এবিষয়ে মর্মান্তবিদ্ধ হইয়াছেন, বাঙালী তাহা বুঝিতে পারিল। রামমোহন ছিলেন তর্কবাগীশ, সূক্ষ্ম চিন্তাশীল, বিচারবুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন। তাহা হইলে কি হয়? ভারতীয় হিন্দু ধর্মে গভীর ভাব ও ভাবুকতা, তত্ত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশীলতার সমাবেশ থাকিলেও তাহার বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান মূলতঃ আবেগমূলক। সেই আবেগ মস্তিষ্কের নহে, হৃদয়ের প্রাধান্য। তাই যুগে যুগে হিন্দু ধর্ম অঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত সংস্কারচিহ্ন পরিস্ফুট হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহা সাময়িক স্রোত-তরঙ্গের মত বিশাল বিশাল ভারতীয় আচারমহাসমুদ্রের প্রভাবের অতলে মিলাইয়া গিয়াছে। রামমোহনের বেলাতেই বা কেন তাহার ব্যতিক্রম হইবে? (রামমোহন হিন্দু ধর্ম সংস্কার করিয়া তাহার যে রূপ দান করিলেন, মূলতঃ বুদ্ধিশাসিত এবং সাধারণ অনুষ্ঠেয় ধর্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহা অধিকাংশ স্থলে অভিজাত ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। তাঁহার—কি তাঁহার অনুচরদের—কাহারও দেশের জনগণের মধ্যে সে ধর্মপ্রচারের ব্যাপক প্রয়াস দেখা গেল না। সেই

জন্যই আবেগবর্জ্জিত রামমোহন কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্মের বহু সংখ্যক অনুকরণকারী সংগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম-অঙ্গে এই সংস্কার সফল হইল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হৃদ্গত একান্ত অনুভূতি, প্রেমমূলক সক্রিয় প্রচার এবং কেশবচন্দ্রের নববিধানের প্রবর্তন সত্ত্বেও, দেখিতে পাই আদি প্রচারকের মৃত্যুর পরে শতবর্ষ যাইতে না যাইতেই রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দু ধর্মের বহু প্রচলিত রূপের মধ্যে কুলায়প্রত্যাশী পাখীর মতই প্রত্যাবর্তন করিবার উপক্রম করিতেছে। কিন্তু কেশবচন্দ্রের নববিধানের আদর্শ, অর্থাৎ সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টা, কখনও বিফল হইতে পারে না।

বাঙালা দেশে রামমোহনের পরেও পাশ্চাত্য ধর্ম ও শিক্ষাসংস্কৃতির বিপুল সমারোহ দেখা যায়। বাঙলার হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডিরোজিওর শিষ্যরা তাহাদের পিতৃ-পিতামহের চির প্রচলিত ধর্ম ও শিক্ষাসংস্কৃতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রধানতঃ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরাই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, অনেকটা না বুঝিয়া এবং অনেকটা আর্থিক সুখসৌকর্য্যার্থে, কিন্তু উক্ত শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্যপুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইয়ং বেঙ্গল দলের অনেকে এবং তাহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া আরও অনেকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। উক্ত শতাব্দীর সূচনাতে খ্রীষ্টান পাদ্রিরা এবং রাজসরকার যে প্রচ্ছন্ন আশা লইয়া বাঙলা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধর্মের বীজ বপন করেন অনতিকাল মধ্যে সেই বীজ বিরাট মহীরুহে পরিণত হয় এবং বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতিকে জয় করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। ইহাকেই কেহ কেহ বাঙালীর 'Cultural defeat' সংজ্ঞা দিয়েছেন। জাতীয় জীবনে ইহার চেয়ে বড় পরাজয় যে আর কিছু হইতে পারে তাহা কখনও শোনা যায় নাই। সে কালের বাংলা সাহিত্যে বিশেষতঃ—মাইকেলের প্রহসনগুলিতে—ইয়ং বেঙ্গল দলের উচ্ছৃঙ্খলতার, বাঙালীর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় পাশ্চাত্য প্রীতি ও পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণের ব্যর্থ ও হাস্যকর

প্রয়াসের পরিচয় যথাযথ ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।

১৭৫৭-সালের পলাশীর যুদ্ধের পরে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে স্বাধীন রাষ্ট্রহারা হয় এবং উভয় সম্প্রদায়ের জাতীয় জীবনে ঘোর দুর্দিন ঘনাইয়া আসে। অতঃপর বিভিন্ন কারণে পাশ্চাত্য ধর্ম, শিক্ষা ও সভ্যতার অমৃত ও গরল একই সঙ্গে বাঙলা দেশে বাঙালী হিন্দুদেরই সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ভোগ করিতে হয়। বাঙালী মুসলমান রাষ্ট্রাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, নিষ্কর বাজেয়াপ্তি এবং অন্যান্য অনেক কারণে ইংরাজ বিরোধী ওহাবী আন্দোলন চালাইয়া, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পূর্ব পর্য্যন্ত ইংরাজ রাজত্ব ও তৎপ্রভাবের গরলই ভক্ষণ করিয়াছে। তাহাদের জীবনে সে গরল অমৃত হইয়া দেখা দেয় নাই। তাই তাহারা এদেশবাসী হইলেও সর্বস্ব হারাইয়া শতাব্দীব্যাপী বিভিন্ন আন্দোলনে অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই একশত বৎসরব্যাপী আবেগপ্রবণ বাঙালীর জাতীয় জীবনে যে দুর্ভোগ, বিপদ ও বিপর্য্যয় ঘনাইয়া উঠিয়াছিল তাহা কি কম? আদর্শভ্রষ্ট বাঙালী জাতি ইংরাজের ঐশ্বর্য্যোজ্জ্বল সমারোহ ও প্রতি-পত্তির দাপট, তাহার গৌরবদীপ্ত জীবনের আঘাতে, অন্ধ অনুকরণের স্রোতে আপনিই যে ভাসিয়া যাইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বাঙালী জীবনের ইহা যে কত বড় অভাবনীয় লজ্জাকর ব্যাপার, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহা শুধু তাহাদের আনুষ্ঠানিক বা আচারঘটিত ধর্ম-অঙ্গে গ্লানিই নহে, ধর্ম সংস্কৃতিতে ও জীবনে একাধারে গ্লানি ও দুষ্কৃতির পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনারাশি।

দ্বিতীয়বারের জন্য ইহাই বাংলার তথা ভারতের হিন্দু ধর্মের সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়া। প্রথমবারে বিপদ ছিল তাহাদের ব্যাবহারিক জীবনে-ইস-লামের গণতান্ত্রিক উন্নত আদর্শের, কিন্তু দ্বিতীয়বারের বিপদ জীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে। ইসলামের প্রতিক্রিয়ায় শঙ্করাচার্য্য ও অন্যান্য আচার্য্যদের বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যায় বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত দিক ক্রমে হৃদয়ের টানে মধ্যযুগের রামা-

নন্দ, কবীর, নানক, জায়সী এবং দাদুপ্রমুখ বহু সাধকের সাধনায় স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের জীবনে তাহা আরও শান্ত এবং সমাহিত ভাবে দেখা দিয়াছিল। এবারের চিন্তা এবং বুদ্ধির দিক রামমোহনেই শেষ হইয়াছিল। তাঁহার ধর্মসংস্কার ও অপূর্ব ব্যক্তিত্ব বাঙালীর সুপ্ত চেতনাকে নাড়া দিলেও আবেগ-প্রবণ ও অশিক্ষিত জনগণের জন্য তাহা যুগোপযোগী হয় নাই। অধিকন্তু তাঁহার পরও পশ্চিমের নানাবিধ প্রভাবের জন্য যুগসংকট ক্রমেই ঘনীভূত হইয়াছে। (জীবন ও ধর্মাঙ্গে এত বড় বিপদের আঘাতে জর্জরিত হইয়া গীত-উপনিষদশাসিত সনাতন ভারতবর্ষের পুণ্যাত্মা নূতন করিয়া সচকিত হইয়া উঠিয়াছে। এক রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্নযুগের বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা পূর্ণ দেহ ও আত্ম লইয়া উচ্ছ্রিত হইয়া উঠিয়াছে। রামকৃষ্ণ লেখাপড়া জানিতেন না। শুধুমাত্র যোগসাধনা ও গভীর অনুভূতির দ্বারা ভারতবর্ষের চিরকালের যথার্থরূপকে আপনার জীবনে পরিস্ফুট করিয়াছিলেন। ইহা যেন অনেকটা ব্যক্তিবিশেষের প্রতীক-রূপ অবলম্বন করিয়া ভারতের গীত-উপনিষদ, বেদবেদান্ত, যাগযজ্ঞ, ধর্ম ও সাধন, কর্ম ও যজ্ঞের যুগের প্রয়োজনে পূর্ণবিগ্রহগ্রহণ। (তাই দেখি এক রামকৃষ্ণের আবির্ভাবে ভারতের সকল কালের সকল সাধনা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।) রামকৃষ্ণের মধ্যে জ্ঞান ও প্রেম এই দুই শক্তি মিলিত হইয়া যুগের প্রয়োজনে যুগামৃত বর্ষণ করিয়াছে। রামকৃষ্ণ তাই সেই যুগের বাঙালীদের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখিয়া চমকিত ও বিদ্বেষদুষ্ট হন নাই, অধিকন্তু স্নেহময়ী জননীর মত তিনি সকলকে হৃদয়ে টানিয়া লইবার জন্য প্রত্যেক মতের মধ্যেই সত্য সন্দর্শন করিয়াছেন। তিনি জানিতেন সত্য চিরদিনই এক কিন্তু সেই সত্যে পৌঁছিবার পথ বিভিন্ন হইতে পারে।) এই উদার মনোবৃত্তিই সে যুগের সকলের কাছে তাঁহাকে প্রিয়তর ও নিকটতর করিয়াছে এবং যে যাহার মত ভুলিয়া অন্তত ক্ষণেকের জন্যও সত্যের মূর্ত বিগ্রহ এই অনাড়ম্বর সন্ন্যাসীর

প্রতি সসম্ভ্রমে দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়াছে।

সে যুগের আত্মভ্রষ্ট বিপথগামী বিপুল বাঙালী জনসাধারণের সম্মুখে বেদ উপনিষদের মূর্তিমান বিগ্রহরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন রামকৃষ্ণ। তাঁহার সাধনা ছিল অন্তর্মুখী এবং তিনি ছিলেন নিষ্ক্রিয়। তাঁহার জীবনের গভীর অনুভূতি তঁাহার দ্বারা সাধারণের মধ্যে প্রসারিত হয় নাই। দৈব-নির্দেশক্রমে সে অভাব পূরণ করিয়াছিলেন বিবেকানন্দ। সে যুগের পাশ্চাত্যশিক্ষা-পুষ্ট, আত্মাভিমানী বিবেকানন্দ ভাববিগ্রহ রামকৃষ্ণ চুম্বক আকৃষ্ট হইয়া গতিশীল হইয়া উঠিলেন। গুরু অপেক্ষা শিষ্যের প্রাধান্য ঘটিল। 'গুরু হইলেন স্থিতি শিষ্য বিবেকানন্দ হইলেন গতি—যেন একই সাধনার এপিঠ ও ওপিঠ।' রামকৃষ্ণজীবনের অনুভূতি বিবেকানন্দে সংক্রমিত হইয়া প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সুমধুর ঝঙ্কার তুলিল। বহুশত বৎসর পরে ভারতীয় সাধনার ধারা ভারত, ইউরোপ ও আমেরিকায় নূতন করিয়া প্রচারিত হইল। রামকৃষ্ণের নিকট হইতে যে গুরুভার বিবেকানন্দ গ্রহণ করিয়াছেন, বিভিন্ন দেশে বিবেকানন্দ তাহা নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার মধ্যে সেই গুরুভার-জনিত একপ্রকার অব্যক্ত ও অলৌকিক বেদনার অননুভূতপূর্ব জাগরণ অগ্নিশিখারূপেই অহোরাত্র তাঁহার প্রাণকে দগ্ধ করিতেছিল। তাই তিনি ভারতের বাহিরে যাহা শুধু বাণীরূপেই উৎসারিত করিয়া আসিলেন বাঙলাদেশে তাহারই ধর্মরূপ দিলেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবার' মধ্যে। তাঁহার আদর্শে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রে এবং হিন্দু-মুসলমানে কোন ভেদাভেদ রহিল না; নিপীড়িত জনগণের মধ্যে তিনি সেবাধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন।

জীবমাত্রই ভগবানের সৃষ্টি। প্রতিজীবের মধ্যেই যখন ভগবান বিরাজ করিতেছেন তখন সেই জীবকেই স্বার্থশূন্য নিষ্কাম ভাবে ভালবাসিয়া তাহার সেবা করিলে সেই সেবা শেষ পর্যন্ত ভগবানেই পৌঁছিবে। এই আদর্শে তাঁহার হৃদয় ও মন উজ্জীবিত হইল। সন্ন্যাসী হইলেন প্রেমিক।

তাঁহার প্রেমে সমগ্র দেশ অবগাহন করিল। উচ্চনীচ ভেদাভেদ না করিয়া অস্পৃশ্যতার তুচ্ছতা দূর করিয়া, এ যুগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগোপযোগী করিয়া সেই বৈদিক আদর্শ প্রচার করিলেন। বিবেকানন্দের আন্তরিক প্রেম ও আদর্শানুভূতিতে যুগ, জাতি ও দেশ একাকার হইয়া গেল। মানুষমাত্রকেই বিবেকানন্দ এমন করিয়া ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সে যুগের বাঙালীর সম্মুখে গীতার অনাশক্ত, নিষ্কাম প্রেম ও কর্ম জীবপ্রীতিতে ও জীবসেবায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। বিবেকানন্দ ইহারই আখ্যা দিয়াছিলেন—Vedanta in practice.

হিন্দুধর্মের পুনর্জীবনসংস্থাপনে সে যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের দানও কম ছিল না। ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষি, ধর্মপ্রবর্তক ও লোকশিক্ষক মহাপুরুষগণ সাধনার দ্বারা যুগে যুগে শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করিয়া যে বাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও সময়োপযোগী করিয়া সে যুগে হিন্দুধর্ম, সাধনা ও সংস্কৃতির প্রতিনিধি রূপে তাঁহার সাহিত্যের ভিতর দিয়া গীতার সেই অমোঘ বাণীই—

'সর্বভূতস্থমাত্মান সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥'

দেশবাসীর নিকট প্রচার করিয়াছিলেন এবং যুগের প্রয়োজনেই শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব ও পবিত্রমাহাত্ম্য অনুভব করিবার ও করাইবার জন্য ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও শ্রীকৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী এবং রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয়। তাঁহার ধর্মান্দোলনের প্রভাব সেইদিন দুঃস্থ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের অপেক্ষা মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ও রক্ষণশীল সমাজের উপর অধিক পরিমাণে পড়িয়াছিল।

হিন্দুধর্ম সংস্কারক ও ব্যাখ্যাতারূপে ইঁহাদের সকলের শেষে আবির্ভাব হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের। তিনি ব্রাহ্ম হইলেও হিন্দু ধর্মের সংহতি-শক্তির উপর বিশ্বাস ছিল তাঁহার অপরিসীম। The regeneration of India

will come through gradual change within the body of Hinduism itself rather than from the action of any detached society like Brahma Samaj (Religious movements in India, Farquhar. P. 384) এমন কথা বলিতেও তাঁহাকে শোনা গিয়াছে।) তাই দেখা যায় আবাল্য উপনিষদের ভাবপরিপুষ্ট রবীন্দ্রনাথের মধ্যে হিন্দুধর্মের আচারঘটিত ব্যবহারিক রূপ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রতি প্রীতি ও প্রবণতার আধিক্য। মানুষের ব্যক্তিত্ববোধ ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে চেতনা জাগাইবার এবং আনুষ্ঠানিক ধর্মের সংস্কার করিবার জন্য তিনি যতই কেন প্রয়াস করুন না, আধ্যাত্মিক ভারতের ও হিন্দুধর্মের পরাতত্ত্বের বাণী তাঁহার সাধনায় ও অনুভূতিতে পূর্ণ ও মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, গীতালি, উৎসর্গ, খেয়া প্রভৃতি কাব্যই এই উক্তির যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ করিবে।'

ঊনবিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য প্রভাবের দুর্জ্জয় প্রতিঘাতে এদেশের জাতীয় জীবন যে ভাবে বিপন্ন ও মোহমুগ্ধ হইয়াছিল তাহারই প্রতিক্রিয়ায় রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ কয়েক জন ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা, মহাপ্রাণ বাঙালীর সাধনায় শুধু হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিক রূপের নয়, অধিকন্তু তাহার আধ্যাত্মিক ও আদি বৈদিক ভাবের নবতর প্রচারের ভিতরে এদেশের লোক আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছিল। ইহাকেই যুগসঙ্কটে সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন বলা হইয়াছে। উপরি উক্ত মনীষীদের আপ্রাণ চেষ্টায় ইহা সম্ভব হইয়াছিল বলিয়াই পশ্চিমের আলোকমুগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বাঙালীরা আপন ঘরে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের বাংলা সাহিত্য ও ধর্ম সাধনার ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। (বিংশ শতকের প্রথম দশকে রাষ্ট্রবিপ্লব ও স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী

জাতীয় জীবনযজ্ঞে যে অনল লোল জিহ্বা মেলিয়া উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, বাঙালীর সাধনালব্ধ ধর্মানুস্যূত জাতীয়তাই তাহাকে সে যজ্ঞে মন্ত্রদাতা পুরোহিতের আসন দান করিয়াছিল।) (পশ্চিমের প্রভাব তাহাকে পূর্ব শতাব্দীতে যে ভাবে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিল তাহারই প্রতিক্রিয়ায় শতার্দ্ধব্যাপী সাধনায় এদেশ শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে, সমাজসংস্কারে ও জাতীয়তাবোধে, শিল্পকলায় ও সাহিত্যে দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই উন্নতির প্রত্যেকটির মূলে ছিল বাঙালীর চেতনালব্ধ ধর্মবোধ এবং সেই ধর্মেরই সমর্থন।) রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই সদ্-বুদ্ধির ব্যাখ্যাকার, ধারক ও বাহক; কিন্তু আবেগপ্রবণ বাঙালী চিরকাল হৃদয়ের যে দিকটায় আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে বিবেকানন্দের আদর্শ ছিলেন সেই দিকের ভাববিগ্রহ, যোগীবর রামকৃষ্ণ। বিবেকানন্দ তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়াই কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন; সেইজন্য জাতির সর্ব সাধারণের জীবনে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রভাবই হইয়াছিল সমধিক কার্যকরী।)

কৃষ্ণনগর শতবার্ষিকি কলেজ ম্যাগাজিন,
১৯৪৮।

বাঙলা দেশে মুসলিম অধিকারের যুগ ও বাঙলা সাহিত্য

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়াতে বাঙলা দেশে মুসলিম বিজয় হয়। হিন্দু সেন রাজাদেরই বাঙলার মসনদ থেকে বিতাড়িত করে মুসলমানেরা এ দেশের রাজা হয়ে বসে। মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি এদেশে প্রবেশ করার বহু পূর্ব থেকেই মুসলমান ওলি আল্লারা এখানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। বৌদ্ধ বিপ্লবের পর হিন্দু রাজারা বাঙলা দেশেও তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ও পুনঃ সংস্থাপনের স্বপ্ন দেখছিলেন। হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি বর্ণাশ্রম ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকায় এদেশে মানুষে মানুষে অশেষ ভেদ রচিত হয়েছিল। সাংস্কৃতিক জীবন রচনার ভার ছিল ব্রাহ্মণদের হাতে, সে জীবনে প্রবেশ করার অধিকার এক ব্রাহ্মণ ছাড়া কারুরই ছিলনা। দেশের সর্বসাধারণের সাংস্কৃতিক জীবন বলতে তেমন কিছুই ছিলনা। বৃহত্তর মানবতা এমনি ভাবে অবহেলিত হচ্ছিল। রাজভাষা ছিল সংস্কৃত। রাজাদের আত্মসন্তোষের জন্য রাজভাষা সংস্কৃতেই তখনকার দিনে সাহিত্য রচিত হোত। জয়দেবের গীত গোবিন্দই তার প্রমাণ।

এদেশের সাধারণ মানুষ নিজেদের ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিল। কারণ দেখেছিল মুসলমান হলেই মানুষের সমান অধিকার ইসলাম স্বীকার করে নিচ্ছে। যে মন্দিরে সাধারণের প্রবেশ অধিকার ছিল না তারই পাশে মুসলমানের মসজিদে যে কোন অবস্থার মুসলমানই সমান ভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। রাজা, প্রজা, দাস ও প্রভুতে সেখানে কোন বিভেদ নাই। বাদশাহও দাস বিয়ে করছে, দাসও বাদশাহ হচ্ছে। উপাসনার পদ্ধতিতে ও সমাজ ব্যবস্থায় এদেশের মানুষ সবচেয়ে ছিল অবহেলিত, ইসলাম প্রচারকদের ও ধর্মাবলম্বীদের

সংসার জীবনে তাই মানবতার স্বীকৃতির এ মনোমুগ্ধকর রূপ দেখে এদেশের অগণিত জনসাধারণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছিল। বৌদ্ধরাও উপাসনার পদ্ধতিতে ও আশ্রম ধর্মে কিছুটা সমান অধিকার স্বীকার করেছে, সে জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের যুগে ভারতের নানা স্থান থেকে উৎপীড়িত হয়ে বাঙলা দেশে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আশ্রয় গ্রহণ করে। বাঙলার হিন্দু সেন রাজাদের আমলে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হতে যায় তখন এদেশের বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধ নানা ভাবে নির্যাতিত হয়। এমনি সময়ে মুসলমান সুফি, দরবেশ ও আওলিয়ারা এখানে ইসলাম প্রচার করেন। এরই ফলে এদেশে তখনও ইসলামের অধিক সংখ্যক গুণগ্রাহী দেখা যায়। ক্ষেত্র পূর্বেই তৈরী হয়েছিল; তাই মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি এদেশে শাসকের রূপ নিয়ে প্রবেশ করলে এখান থেকে তেমন বাধা পায়নি। সেন রাজারা সহজেই তাদের শাসন ছেড়ে গেছে। আর দেশের মুক্তিকামী জনসাধারণ মুসলিম রাজশক্তিকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে।

মুসলমান কর্তৃক বাঙলা দেশ বিজয়ই বাঙলা দেশের সংস্কৃতি সাহিত্যের ক্ষেত্রে অশেষ কল্যাণের হয়। বৌদ্ধ আমলে এদেশের জন-সাধারণের বাঙলাতে কিছু দোহা বা গান রচিত হয়েছিল। হিন্দু আমলে জনসাধারণ ছিল অবহেলিত, তাদের ভাষাও ছিল অপাংক্তেয়। সাংস্কৃতিক ভাষা হিসাবে তারা সংস্কৃতেরই চর্চা করছিল। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার কোন মর্যাদাই ছিলনা। মুসলমানেরা এদেশে রাজার বেশ ধরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই এদেশের সাধারণ মানুষের ভাষার দিকে তাদের নজর পড়লো। মুসলমান শাসনকর্তারা ইরাণ তুরাণ যেখানকারই লোক হোকনা কেন এদেশে আসার পর, এদেশকে ভালবেসেছিলেন। এদেশের মানুষকে যে শুধু শাসন করতে হবে তা নয় এদের মধ্যেই জীবন কাটাতে হবে এ বুদ্ধিও তাঁদের সেদিন হয়েছিল। তাই দেখে এদেশের সর্বসাধারণের চিত্তজয় করবার জন্য তাদেরই মুখের ভাষায় সাহিত্য গড়ে তুলবার প্রেরণা তাঁরাই যোগা-

লেন। মুসলমান শাসকদের অধিকার বিস্তৃতির যুগে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বপ্রথম মহাভারতের বাঙলা অনুবাদ হয়। ব্রাহ্মণ তথা উচ্চ বর্ণের হিন্দুর আচরণীয় দেব ভাষা থেকে মহাভারতের বিষয়বস্তু এমনি ভাবে সেদিন দেশের সর্বসাধারণের নাগালের মধ্যে এসে পড়ে। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের দিক থেকে এযে কতবড় অভাবনীয় ব্যাপার আমরা আজ তা হয়তো তেমন ভাবে বুঝতে পারবোনা। কিন্তু মুসলিম শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় সেদিন বাঙলা ভাষাও সাহিত্যের পক্ষে এমনি এক মহাবিস্ময়কর বিপ্লবই সংঘটিত হয়েছিল। তাই সেদিন রক্ষনশীল ব্রাহ্মণ সমাজ মহাভারতের অনুবাদকারীদের "সর্বনেশে" নামে অভিহিত করেছিল। রৌরব নরকেও তাদের স্থান হবেনা এমন ভাবেই তাদের অভিশাপ দিয়েছিল। মুসলিম নরপতিদের কল্যাণে একদিকে যেমন বাঙলার সাধারণ অধিবাস দের ভাষার মুক্তি সংঘটিত হল, সে ভাষায় সাহিত্য রচনা করারও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্যের বিষয়বস্তুতেও এলো পরিবর্তন। 'এর পূর্বের বৌদ্ধ যুগের বাঙলা সাহিত্য ধর্মানুভূতি বিষয়ক সংগীতেরই সমষ্টি, আর হিন্দু যুগের সাহিত্য দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার আতিশয্য, মুসলমান আমলের গোড়াতে এ দ্বিবিধ বিপদমুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের ভাষায় যে বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি হলো, তাতেই দেখি মানুষেরই চরিত্র-চিত্রন জনিত মহাকাব্যের সূত্রপাত। মহা-ভারতে দেবতা আছে, আধা দেবতাও বহু আছে কিন্তু যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, কর্ণ, দ্রোণ, শকুনি, নকুল, সহদেব দ্রোপদী এরা সকলেই মানুষ। এ চরিত্রগুলোর ভিতরে চিরন্তন সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ, কর্মনিষ্ঠা, জাগ্রত বুদ্ধি, আর কুট নৈতিক চাল ইত্যাদি সব কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায় সুতরাং অনুবাদ হলেও মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলা ভাষায় মহাভারতের প্রকাশ সাহিত্যেরই অনেকটা যুগ পরিবর্তনের ইংগিত সুস্পষ্ট করে তোলে।

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের প্রেরণায় সর্বপ্রথম মহাভারত অনুদিত হয়। হোসেন শাহের যুগের কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত পাচালীতে তার উল্লেখ আছে। কিন্তু তা ছাড়া এ সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয়নি। তা না হোক, বাঙলা ভাষাদরদী এ মহানুভব বাদশাহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মুক্তি দিয়েছিলেন। আজকের পরিবর্তিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দেশ, জাতি ও ভাষার ইতিহাস নতুন করে রচনা করার সময়ে তাঁর এ অমর কীর্তি আমরা শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করি।

এর পর গৌড়ের মুসলমান সুলতানেরা নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের প্রবর্তিত পথে দেশী ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও ব্যাপক ভাবে বাঙলা সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয়, আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে। হোসেন শাহ বাঙলার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরাগল খাঁ নামীয় তাঁ'র এক সেনাপতির অধীনে তখন চট্টগ্রাম শাসিত হোত। হোসেন শাহের মত তিনিও বাঙলা সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন। কবীন্দ্র উপাধিধারী পরমেশ্বর দাস পরাগল খাঁর আদেশে বাঙলায় আদি থেকে স্ত্রী পর্ব পর্যন্ত মহাভারতের অনুবাদ করেন। দেশের রাজা করছেন দেশীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা আর চিরকালের অবহেলিত কবি সমাজ রাজদরবারে পাচ্ছেন সমাদর, তখনকার দিনের বাঙলা কবিদের পক্ষে এ যে কত বড়ো সৌভাগ্যের ব্যাপার তা ভেবে কবীন্দ্র পরমেশ্বর হোসেন শাহকে কলিকালে কৃষ্ণের অবতার বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর কথাতেই আমরা পাই :—

নৃপতি হোসেন শাহ হয় মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্রেশস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হবুসেন কৃষ্ণ অবতার॥

হোসেন শাহ দেশী সাহিত্যের ভক্ত ও রীতিমত গুণগ্রাহী ছিলেন।

মালাধর বসু তাঁর গৌড়ের সিংহাসনারোহনের কিছুদিন পূর্বেই ভাগবতের অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর যথাযোগ্য সমাদর করে তাঁকে গুণরাজ উপাধিতে ভূষিত করেন। শুধু অনুবাদ সাহিত্য নয়, তখনকার দিনে মঙ্গলকাব্য রচনা করারও রীতিমত রেওয়াজ ছিল, যিনি যে কোন সাহিত্য রচনা করুন না কেন, হোসেন শাহের বদান্যতার ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তাঁর নাম আপনাপন সাহিত্যে সসম্মানে উল্লেখ করতে ভুলতেন না।

হোসেন শাহের কর্মচারী ও যশোরাজ খানের রচিত একটি বৈষ্ণব কবিতায় এই ভাবে হোসেন শাহের নাম পাই :

শ্রীযুক্ত হুসন, জগতভূষন সেহত্র হিরন জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর ভনে যশোরাজ খান।

রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা কোন সাহিত্যের ইতিহাসে কতখানি তা যারা গ্রীসের পেরিক্লিসের যুগ আর ইংলণ্ডের এলিজাবেথের যুগের সংগে পরিচিত আছেন তাঁদের কাছে নতুন করে বলতে হবেনা। বাঙলা দেশে মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠার ও বিস্তরের যুগে মুসলমান নবাব বাদশাহদের সুস্থ রাজনৈতিক ও ধর্মবুদ্ধি এদেশের জনসাধারণের জন্য যেমন প্রভূত কল্যাণের হয়েছিল তেমনি জনসাধারণের ভাষায় রচিত বাঙলা সাহিত্যের নানাদিকে বৈপ্লবিক বিকাশ সম্ভবপর করে তুলেছিল। ইংরেজ বিজয়ের কালেই যেমন উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর, এ কালের বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্নমুখী বিকাশ দেখি, তেমনি মুসলমানদের দ্বারা এদেশ জয়ও মধ্য যুগে বাঙলা সাহিত্যের উন্মেষ ও অভ্যুদয়ের জন্য অশেষ কল্যাণের হয়ে আছে। তাদের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যদরদী হোসেন শাহের স্থান সকলের উপরে। এই নরপতি বাঙলা সাহিত্যের অগ্রগতির জন্য রাজপথ নির্মান করে দিয়ে গেছেন। সুতরাং আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকে ইংলণ্ডের এলিজাবেথ কি গ্রীসের পেরিক্লিসের সংগে তুলনা করলেও কোন অন্যায় হয় না।

আজকের দিনে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা

করার সময়ে আসুন আমরা সেই গুণগ্রাহী নরপতি হোসেন শাহের কথা কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করি। *

'সংস্কৃতি' মুসলিম হল ম্যাগাজিন,
১৯৫১।

---

* ১২-১-৫০ তারিখে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এবং তাঁদের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

কবি সৈয়দ সুলতান

বাঙলাদেশে যে সব মুসলমান কবি বাঙলা সাহিত্যের সাধনা করেছেন যতদূর জানা যায়, সৈয়দ সুলতানই তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম। বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগে আমরা বহু খ্যাতনামা মুসলিম কবির সঙ্গে পরিচিত হই : কাজী দৌলত, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর ও হায়াত মামুদ প্রমুখ কাহিনীকার কবিরা সকলেই তাঁর পরে এ সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেন। সৈয়দ সুলতানের সময় জ্ঞাপক একটি চরণ পাওয়া যায়—'গ্রহ সত রসযোগে অব্দ গোঙ্গাইলা', এ থেকে তার কবি কীর্ত্তির কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ কিংবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ধরা হয়। তিনি বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রামের অন্তর্বর্তী পরাগলপুরের অধিবাসী ছিলেন।

সৈয়দ সুলতানের অনেকগুলি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। নবীবংশ, শবে মেয়েরাজ, হজরত মোহাম্মদ চরিত, ওফাতে রসুল, ইব্লিছের কিচ্ছা, জ্ঞান চৌতিশা ও জ্ঞান প্রদীপ এ কয়টির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত মূল কাব্য সংখ্যা ছিল তিনটি—জ্ঞান প্রদীপ, নবীবংশ ও শবে মেয়েরাজ, উদ্ধৃত কাব্যগুলো এই কাব্যত্রয়েরই অংশ বিশেষ।

নবীবংশ সংস্কৃত হরিবংশের ও মহাভারতের মতই বিরাট গ্রন্থ। মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ বিশ্বাস ও ধারণামতে এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের কথা শোনা যায়। সংখ্যা গণনা ক'রে অতজন পয়গম্বরের হাদিস অবশ্য পাওয়া যাবে না ; তবু নবীবংশ নামক গ্রন্থে বহু নবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আরবী ও ফারসী থেকে সার সংগ্রহ করেই তিনি নবীবংশ রচনা করেছিলেন। বটতলারকল্যাণে নবীবংশ বা 'কাসাসোল আম্বিয়া' ব'লে যে কেতাবটি পাওয়া যায় পড়ুক বা না পড়ুক বহু মুসলমান তা আজও সযত্নে রক্ষা করে আসছে। এ গ্রন্থটি অতীতে কি বর্তমানেও যদি

কোন প্রতিষ্ঠান সুসম্পাদিত আকারে বের করতো তা হলে বাঙালী হিন্দু সমাজের মহাভারতের মতোই যে তা আমাদের সমাজে সমাদৃত ও পঠিত হ'য়ে আসতো তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ প্রচলিত 'কাসাসোল আম্বিয়া'তে কবির ভাষার স্বচ্ছতা, স্বাভাবিকত্ব ও মনোহারিনী কবিত্ব সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। তিনি সুলেখক ছিলেন; ভাষা, অলঙ্কার জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য তাঁর কম ছিল না। ইসলাম ধর্মের বিষয়বস্তু ও নবী কাহিনী সম্বল ক'রে সাহিত্য রচনা করতে গেলে কল্পনার সাহায্যে কবিত্ব সৃষ্টির অবসর মিলে অল্প; তবু সেই স্বল্প পরিসর বিষয় বস্তুর মধ্যে সৈয়দ সুলতান পূর্ণমাত্রায় কবিত্বের সুযোগ গ্রহণ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ এ পংক্তি-গুলো লক্ষ্যযোগ্য—

তপন পিরিতি মনে ভাবে অতি
নলিনি বিকাশ ভেল।
বিধির ঘটন না হেল দর্শন
কালো মেঘে আচ্ছাদিল॥

(শবে মেয়েরাজ)

কিংবা—

সুমেরু গিরির আড়ে গেল দিবাকর
দিশি যাই নিশি আইল অতি ঘোরতর॥

আবার—

শুনহ পবন তুমি আমার বচন
কহিও সোয়ামির পদে মোর নিবেদন॥

সৈয়দ সুলতানের ভাষায় প্রাচীনত্বের স্বাদ গন্ধ ও ছাপ পরিস্ফুট অথচ সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতা আছে।

সেকালের শক্তিশালী কবিদের সকলেই কিছু না কিছু পদ রচনা করতেন। সুতরাং তিনিও যুগ প্রভাব মুক্ত ছিলেন না। পদাবলী তাঁর

কবি—প্রতিভার প্রধান কি একমাত্র বাহন নয় অথচ এই পরমার্থ বিষয়ক পদাবলীতেই তাঁর আধ্যাত্মিক আকুলতা ও ভাষায় সঙ্গীতের সুর লালিত্য দেখি।

তাঁর সমসাময়িক কালে তাঁর প্রতি মুসলমান সমাজের কিছু অবজ্ঞা থাকলেও পরবর্তীকালে তিনি সমাদর লাভ করেছিলেন। কবিকে ভবিষ্যৎ বাণী করতে শুনি—

'বঙ্গদেশে যথেক আছএ মুসলমান
মোহোর বচন সবে কর অবধান।"

তাঁর ভবিষ্যৎ স্বধর্মীরা তাঁর কাব্য রীতিমতো প্রচার করেছিল; তাঁর বৃহৎ কাব্যসমূহের বিশিষ্ট অংশগুলি পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে আজও পাওয়া যাচ্ছে।

বাঙলা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক-নরপতি হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ এবং তাঁর পুত্র ছুটী খাঁয়ের অনুপ্রেরণায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী প্রমুখ কবিরা মহাভারতের বাঙলা অনুবাদ করেন। ষোড়শ শতকের প্রথমার্দ্ধেই তাঁদের অনুবাদ সম্পন্ন হয়। সৈয়দ সুলতান এদেরই সমসাময়িক। মুসলমান নরপতিরা কিছুটা তাঁদের ধর্মের শিক্ষায় এবং কতকটা শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক চাল হিসাবে উদার নৈতিক মনোবৃত্তি থেকে হিন্দু কবিদের সাহায্যে সর্বসাধারণের ভাষা বাঙলায় এদেশেরই পুরাণেতিহাস রামায়ন মহাভারতের অনুবাদ করিয়েছিলেন। মুসলীম আমীর ওমরাহ্‌দের এবং তদানিন্তনকালের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারগুলোর চর্চার ভাষা ছিল ফারসী। সে যুগের আলেমওলামারাও আরবী ফারসীর সাহায্যে তাঁদের কাজ চালাতেন। দরবেশ ও অলি আল্লাদের চরিত্রগুণে ও অলৌকিকতায় মুগ্ধ হ'য়ে জাতিভেদ পীড়িত বাঙলা দেশের অসংখ্য লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তারা মুসলমান হলেও তাদের মধ্যে অনেক অনৈসলামিক আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তাদের বোধগম্য দেশীভাষায় ইসলামী

সামাজিক বিধান ও শরাহ শরীয়তের বিধি নিষেধ তাদের সামনে তখনও কেউ তুলে ধরেনি। (বাঙলা তথা সেকালের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে বাঙলায় অনুবাদ করতে প্রেরণা যুগিয়েছেন মুসলমান নবাব বাদশারা। সেই সূত্রে এদেশের হিন্দু জনসাধারণের আশা, আকাঙ্খা, তাদের আদর্শচরিত্র ও সমাজের আচরণীয় বিধি বিধান জনসাধারণের ভাষায় ব্যাপক ও বহুল প্রচলিত হলো। প্রজাসাধারণের চিত্ত অমনিভাবে তাঁরা জয়লাভ করলেন। যে জনসাধারণ এতকাল হিন্দু সমাজের উচ্চ বর্ণের লোকদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষায় ও আপন সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় যথ যথ ধারণা থেকে বঞ্চিত ছিল, মুসলিম নরপতিদের দূরদৃষ্টির জন্যই সে সম্বন্ধে তাদের সম্যকজ্ঞান হলো।) এতে মনে মনে তারা তাদের শাসকদের দুহাত তুলে আশীর্বাদ করলো এবং তাদের আজ্ঞাবহ ও অনুবর্তীও হয়ে উঠলো। কিন্তু ধর্মান্তর গ্রহণকারী বিপুল সংখ্যক মুসলমানের জন্য দেশী ভাষায় ইসলাম কাহিনী রচনার রাষ্ট্রগত কোন প্রেরণা তখনও দেখা যায়নি। সৈয়দ সুলতান একক প্রয়াসে সেই দিনে ইসলামের আদর্শ, পীর পয়গম্বরদের মাজেজা ও অলৌকিকত্ব এবং মুসলমানদের জীবন কাহিনী দেশী ভাষায় রচনা ক'রে অসাধ্য সাধন করে গিয়েছিলেন।

সৈয়দ সুলতানের দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি পীর ছিলেন—ইসলামের যথাযথ খাদেম ছিলেন। হাদিস আলোচনা করলে দেখা যায় আলেমরাই আগে বেহেস্তে যাবেন কিন্তু এলমের সদ্ব্যবহার না করলে কিংবা অপব্যবহার করলে তাঁদেরই দোজখে যেতে হবে সকলের আগে। আলেম যেখানে বসবাস করছেন সেখানকার মানুষের কোন কল্যাণেই যদি তিনি না আসেন তবে তার এলমের সার্থকতা রইলো কোথায়? কবি সুলতানের সে জ্ঞান ছিল, তাঁকে বলতে শুনি—

দেশেত আলিম থাকি যদি না জানাএ।
সে আলিম নরকেত যাইব সর্বথাএ ॥
নর সবে পাপ কৈলে আলিমেরে ধরি।
আল্লার সাক্ষাতে মরিবেন্ত দণ্ড বাড়ি ॥
তোম্যারা সবের মেলে মোর উতপন।
তে কারণে কহি আহ্মি শাস্ত্রের বচন ॥
আল্লায় বুলিব তোরা আলিম আছিলা।
মনুষ্যে করিতে পাপ নিষেধ না কৈলা ॥
আছুক আপনা পাপ আলিমে খণ্ডাইব।
—পরের পাপের লাগি লাঘব পাইব ॥

এক দিকে ইসলামের প্রতি আন্তরিকতা ও মমতা অজ্ঞ মুসলিম জনসাধারণকে দীন ইসলামী শিক্ষা দিবার ও মুসলিম তমদ্দুনের সঙ্গে পরিচিত করার জন্য আন্তর প্রেরণা আর অন্য দিকে নিজের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে একাগ্রতা—এই দুই মহৎ প্রেরণার বশবর্তী হ'য়ে বাঙলা ভাষায় ইসলামের সেবায় তিনি অগ্রণী হন। তখনকার দিনে তাঁকে নিরুৎসাহ করার মতো লোকের অভাব হয়নি। (কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে বাঙলায় রামায়ন মহাভারত অনুবাদ করার জন্য ব্রাহ্মণেরা 'সর্বনেশে' আখ্যা দিয়েছিল; রৌরব নরকেও তাঁদের ঠাঁই হবেনা ব'লে তাঁদের উপর বর্ষণ করেছিল অভিসম্পাত; তেমনি তথাকথিত আলেমরা এবং শারাপতি-দাবীদার গোঁড়া মুসলমানরা বাংলায় দীন-ইসলামী কথা রচনা করার জন্য সৈয়দ সুলতানকে 'মোনাফেক' আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি।) কবি তাদের কৃপা করেছেন. পৃথিবীতে যত অধিক ভাষায় নবী-চরিত রচিত হবে, কোরান হাদিসের মর্মকথা ব্যাখ্যাত হবে, মুসলমানের সংখ্যা তত বাড়বে সে সম্বন্ধে যুক্তি দিয়েছেন; সেই সঙ্গে বাঙলা দেশে জন্মগ্রহণ করেও যারা বাঙলা ভাষাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে শেখেনি তাদের প্রতি ক্ষমাহীন

নির্মম উক্তি করেছেন। বাঙলা ভাষার জন্য তাঁর অপরিসীম প্রীতি ও প্রগাঢ় স্নেহ উপচে পড়ছে। তাঁর কাব্য থেকে যথেচ্ছভাবে আহৃত নিম্নের দৃষ্টান্ত গুলো আমাদের এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ করবে—

কর্মদোষে বঙ্গেতে বাঙালী উৎপন।
না বুঝে বাঙালী সবে আরবী বচন॥
আপনা দীনের বোল এক না বুঝিলা।
পরস্তাব পাইয়া সব ভুলিয়া রহিলা॥

(শবেমেয়েরাজ)

*   *   *

যে সবে আপনা বোল না পারে বুঝিতে।
পঞ্চালী রচিলুম করি আছএ দোষিতে॥
মোনাফেক বলে মোরে কিতাবেতু পড়ি।
কিতাবের কথা দিলুম হিন্দুয়ানী করি॥

*   *   *

এতভাবি নবী বংশ পাঁচালী রচিলুম।
আল্লা এক মনে ভাবি প্রচার করিলুম॥
তে কারণে কত কথা পশু বুদ্ধি নরে।
কিতাব ভাঙ্গিলুম করি দোষএ আহ্মারে॥

(শবেমেয়েরাজ)

*   *   *

আল্লায় কহিছে মোরে দেশের যে ভাষ।
সে দেশে সে ভাবে কৈলুম রছুল প্রকাশ॥
যতেক রসুল নবী পয়গম্বর হৈছে।
উম্মতের যে ভাষা সে ভায়ে সৃজিয়াছে॥

*   *   *

কত দেশে কত ভাষে কোরাণের কথা।
দীন মোহাম্মদী বুঝি দেঅন্ত ব্যবস্থা ॥

*   *   *

যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষ তাহার অমূল্য সেই ধন ॥
পাপী সবে পেলে ছিদ্রি আল্লার প্রচারি।
ছৈয়দ সোলতানে সব দিল ব্যক্ত করি ॥

কবির কল্পনায় ঐতিহাসিক সত্য কিছুটা বিকৃত ও কিছুটা অতিরঞ্জিত হয়; নবীবংশে ও শবেমেরাজে সৈয়দ সুলতান তাঁর কবি প্রতিভার সুযোগ কিছু পরিমাণে নিয়েছিলেন। শরীয়াৎ পন্থী ও গোঁড়া সম্প্রদায় তাতেই—আল্লাহ ও রসুলের অবমাননা (ছিদ্র) দেখে কবির প্রতি রুষ্ট হয়। কবি তার জওয়াবে বলেন—

মহিমা সে আল্লার দিলুম প্রচারিয়া।
মহিমার ছিদ্রি বোলে মনে না ভাবিআ ॥
পয়গম্বর সবের মহিমা প্রচারিলুম।
পাপমতি ইব্লিছের অযশ ঘোষিলুম ॥

সুতরাং ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উপকার বৈ অপকার তিনি করেননি, তাঁর সে সান্ত্বনা আছে; লোকে যেন তাঁকে হিতকারী বলেই মানে—

তোহ্মার সবের মৌঞি জান হিতকারি।
ইমা ইসলামের কথা দিলাম প্রচারি ॥
যেরূপে সৃজন হৈল সুরাসুর গণ।
যেরূপে সৃজন হৈল এ তিন ভুবন ॥
যেরূপে আদম হাওয়া সৃজন হইল।
যেরূপে যথেক পয়গম্বর উপজিল ॥
বঙেতে এসব কথা কেহনা জানিল।
নবীবংশ পাঁচালীতে সকলে শুনিল ॥

(শবেমেয়েরাজ)

স্বজাতি ও স্বধর্মী মানুষের ক্রোধভাজন হলে তার উত্তর এই ভাবে দেওয়া যায় কিন্তু "ভাষায়" খোদা ও রসুলের মহিমা প্রচার করতে গিয়ে কিংবা তাদেরকে নিয়ে কাব্য সৃষ্টি করতে গিয়ে যদি তাদের কাছে অপরাধী হ'য়ে থাকেন তা হ'লে তো সেখানে তিনি অসহায় ; সেখানে তখন নিজের অন্তরকে যাঁচাই করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকেনা তাই আমাদের কবিও সে অবস্থায় খোদার কাছেই আশ্রয় নিয়েছেন—

মোহোর মনের ভাব জানে করতারে।
জথেক মনের কথা কহিমু কাহারে ॥

সৈয়দ সুলতান কালের দিক থেকেই যে শুধু প্রথম মুসলমান কবি তা নন, বাঙলা ভাষাতে স্থায়ীভাবে ইসলামের সেবারও সার্থক অগ্রণী তিনিই। একাল পর্যন্ত বাঙলায় ইসলামী আদর্শমূলক যিনি যা কিছু রচনা করেছেন পথিকৃৎ হিসাবে তিনিই সকলের পুণ্যেরও হকদার হবেন !

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বিবদমান হিন্দু ও মুসলিম ও মুসলিম সংস্কৃতির নানাদিকে ও নানাভাবে সমন্বয় সাধিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এ সময়ে বহু উদার মতাবলম্বী মানুষেরও জন্ম হয়। বর্ণ শ্রমের ভিত্তিতে রচিত ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে ইসলামের সুস্থ, সহজ ও আকর্ষণীয় সমাজ-বুদ্ধি যে আলোড়ন তোলে তাতে বহু হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণ ক'রে মুসলমান হ'য়ে যেতে থাকে ; ফলে একদিকে রক্ষণশীল উচ্চ-বর্ণের হিন্দু সমাজ যেমন মুসলমানদের অবজ্ঞা করে অন্যদিকে তেমনি ইস-লামের এই সাংস্কৃতিক বিজয়ের হাত থেকে হিন্দু ভারতকে বাঁচানোর জন্যই এই শতাব্দীগুলোতেই উদার পন্থী হিন্দুর জন্ম হয়। কবীর, নানক, দাদু, মীরা ও চৈতন্য এ যুগের এই সংঘাতেরই মহৎ সৃষ্টি। এঁরা যেমন ইসলামের সার্বজনীন মানবতাকে বুঝতে চেয়েছেন তেমনি সেই দৃষ্টিভংগী থেকেই হিন্দুধর্মেরও শ্রেষ্ঠ অংশকে সাধারণের সহজ বোধ্য করে হৃদয় দিয়েই পরিবে-শন করতে চেয়েছেন। ভাব ও সাংস্কৃতিক মিলনের এ সাধু প্রয়াস শাস্ত্র-

গত ধর্মের রূপ কিছুটা বিকৃত যে হয়নি তা নয়, তবু তার মধ্যেই সেকালে দুই বিভিন্নমুখী ধর্ম সমাজ জীবনের অদ্ভুত মিলনে বহু সঙ্কর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। (ভারতবর্ষে মুসলমানের তাসাউওফ ও হিন্দুর যোগসাধনা পারস্পরিক প্রভাব স্বীকার ক'রে নিয়েই বেড়ে উঠেছে। তা ছাড়া সংগীতে শিল্পকলায়, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে ও সাহিত্যেও এ সমন্বয় কম দেখিনা। চৈতন্য পরবর্তী বাঙলার বৈষ্ণবসাহিত্যেও যে এমনি মিলন সাধনের প্রয়াসজাত ভাব রাজ্যের সৃষ্টি তাও স্বীকার করতে হয়। এপর্যায়ে মুসলমান কবিরা বৈষ্ণবগান লিখেছেন তাও যেমন সত্য তেমনি ইসলামের সার্বজনীন ভাতৃত্ব ও উদারবোধের দ্বারা হিন্দু মানসেও পরিবর্তন সুস্পষ্ট। রাধাকৃষ্ণ তো রূপক মাত্র। সেই রূপকের আবরণ ভেদ করতে পারলে দেখা যাবে পারস্যের সুফী কবিদের মতো ভক্ত বৈষ্ণবেরাও প্রেমের পেয়ালা হাতে করে খোদারই সান্নিধ্য পাবার আশায় আপন মানসবনে অভিসার করে মরছে।) যে কালে এদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে এ বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধিত হয়েছে; সৈয়দ সুলতান সেকালেরই কবি। তাঁর কাব্য 'জ্ঞান প্রদীপই' 'নবীবংশ' ও 'শবে মেয়েরাজে' তাই এ ধরণের এক সমন্বয় সাধনের প্রয়াস তিনি করেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ দেবতাদেরও যেমন তিনি নবী ব'লে স্বীকার করছেন, তেমন আমাদের নবীজীর প্রতিও অবতারত্বের আরোপ করতে চেয়েছেন। শরীয়ৎ-পন্থী মুসলমানেরা এ কারণেই তার প্রতি ক্ষুব্ধ হ'য়ে থাকবেন। স্বীকার করি তাঁর দৃষ্টিভংগীতে ত্রুটি আছে তথাপি তিনিই যে ইসলামের মর্মকথাকে বাঙলাভাষায় প্রবাহিত করে দিয়ে সাধারণ মুসলমানকে স্বীয় ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন আজ এতকাল পরে সে কথা স্মরণ করার সময় এসেছে। তাঁর দূরদর্শিতা, ইসলাম প্রীতি এবং সমাজ ও স্বধর্মের সেবার জন্য তিনি বাঙলাভাষাভাষী মুসলমানদের অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হয়ে থাকবেন।)

মাহে-নও,
শ্রাবণ, ১৩৫৭।

কবিগুরু আলাওল

আলাওল নামটাই যেন কি ধরণের ; মুসলমানের নাম হিসাবে তা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ এ নিয়ে হয়ত আজ আমরা তর্ক করতে পারি কিন্তু ঐ নামটি মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে আপনকীর্তির মহিমায় ভাস্কর হয়ে আছে ; ঐ নামধারী ব্যক্তিটি মুসলমানের চির আদরের, চির গৌরবের পাত্র। সে যুগের বাঙলা সাহিত্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের লক্ষণ ছিল না, সে জন্যেই খুব সম্ভব তখনকার লেখকেরা নিজে নাম ধাম ও আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেছেন। তাঁদের রচিত সাহিত্য বেঁচে থাক, তাঁদের কথা কেউ জানুক বা না জানুক সেদিকে তাঁদের খেয়াল ছিল না। তা ছাড়া তখনকার দিনে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার ফল ছাপাখানা ইত্যাদি না থাকার জন্য হাতের লেখা পুঁথি তেমনি থেকে যেত। একেতো আমাদের সাঁ্যাত সেঁ্যতে দেশ তাতে আবার উই আর ইঁদুরের উৎপাত। ফলে হাতের লেখা পুঁথি প্রায় নষ্ট হয়ে যায়। বহু কষ্টে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে পুরানো দিনের যে সব পুঁথির উদ্ধার হয়েছে তাতে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস নবঘটিত হলো। কিন্তু সেকালের সাহিত্যিক মনীষিদের জীবনী ও কবি কীর্তির কথা যথাযথভাবে নির্দ্ধারিত হওয়ার আজ আর কোন সম্ভাবনাই নাই। তাঁদের রচনার মধ্য থেকে যতটুকু ছিঁটে ফোটা পরিচয় পাওয়া যায় তা নিয়েই এ যুগের অনুসন্ধিৎসু মনেরও সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

আমাদের আলোচ্য কবি আলাওলের যথার্থ নাম, তাঁর জীবৎকাল, পিতৃপিতামহের পরিচয়, তাঁর জন্মভূমি এ-সবই আজ অনুমানের বিষয়। তাঁর কাব্যগুলো থেকে এ সব বিষয়ে যে ইংগিত পাওয়া যায় তা দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারলেও, পরিপূর্ণ জ্ঞান আমাদের হয় না।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন তাঁর জন্ম ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে আর মৃত্যু ১৬৮০

তে। তিনি যে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক তা অবশ্য অবধারিত সত্য। তাঁর জন্মস্থান ফরিদপুরের ফতেয়াবাদ পরগণায়, না চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে সে বিষয়ে তর্ক আছে। ফতেয়াবাদ পরগণা বর্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। কবির পিতা ফতেয়াবাদে শাসনকর্তা মজলিস কুতুবের অমাত্য ছিলেন।

কবির নিজের কথায় তাঁর পরিচয় পাই—

মজলিস কুতুব এই রাজ্যের ঈশ্বর। *(ফতেয়াবাদের)
তাহান অমাত্যসুত মুই সে পামর। (সয়ফল মুল্লুক বদিউজ্জামাল)

কিংবা

রাজ্যেশ্বর মহারাজ কতুব মহাশয়
মুঞি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয় ॥

এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে তিনি ফতেয়াবাদেই জন্মগ্রহণ করেছেন। কবির কবর আছে চট্টগ্রামে এবং বংশধরেরাও চট্টগ্রামে বাস করছেন; তা থেকেও অবশ্য জোর করে বলা যায় না যে তিনি চট্টগ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

আলাওল যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন তাঁর প্রথম প্রকৃত পরিচয় পাই আরকান রাজ সভায়। কবি ও কবিপিতা জলপথে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলেন। পথে পর্তুগীজ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে কবিপিতা শহীদ হন। ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে আলাওল চট্টগ্রামে না গিয়ে একেবারে আরাকান রোসাঙ্গ রাজদরবারে পৌছেন এবং সেখানে অশ্বারোহী সৈনিক নিযুক্ত হন; কিছুদিনের মধ্যে আপন পাণ্ডিত্য ও কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়ে রাজ অমাত্য মুসলমান মাগন ঠাকুরের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হয়ে ওঠেন। মাগন ঠাকুর নিজেই কবি ও গুণীলোক ছিলেন; সুতরাং তিনি আলাওলের মতো গুণীব্যক্তির গুণের সমাদর করলেন। অবিমিশ্র সুখভোগ আলাওলের ভাগ্যে ঘটেনি; নানা প্রতিকুল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম

করে তাঁকে কাব্যসাধনা ও জীবনের পথে এগোতে হয়েছে।

আরাকানের রোসাঙ্গ রাজদরবারে তখন মগদের শাসন অথচ বাঙলার বাইরে সেখানে বাঙলা সাহিত্যের চর্চা দেখে বিস্মিত হয়ে যাই। বৃহত্তর বাঙলার অন্তর্গত বলেই হোক কিংবা বাঙলাদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র থাকার জন্যই হোক বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে রোসাঙ্গ রাজদরবারে স্থায়ী দান রয়ে গেছে। বাঙলা সাহিত্যে ধর্মনিরপেক্ষ কাহিনী কাব্যের সূত্রপাত হয় এই রাজসভায়। কবি কাজি দৌলত, আলাওল ও মাগনঠাকুর বাঙলা কাব্য সাহিত্যে এ শাখার যুগ প্রবর্তক।

(বাঙলা দেশে তখন মুসলিম শাসন চলছে। এ দেশের রাজভাষা ফারসী। শাসকের জাতির সাংস্কৃতিক ভাষা ফারসী, আরবী এবং তার সমসূত্রে উর্দুও। আরবী, ফারসী সাহিত্য বর্ণবহুল romantic গালগল্পের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। মুসলমান কবিরা তাঁদের প্রেরণার উৎস আরবী ফারসী ও উর্দু সাহিত্য থেকে অনুবাদ করে বাঙলা সাহিত্যে বৈচিত্র্যের সমাবেশ করলেন। এতদিনের ধর্ম-নির্ভর বাঙলা সাহিত্যে নূতন বিষয়বস্তুর আমদানীতে মানুষের জীবনরস, তাদের ভাবনা কল্পনা, এবং মনঃজগতের দ্বিধাহীন অভিসারের রাজ্য উদঘাটিত হয়ে গেল। নব নব বিষয়বস্তুর ভাবের আমদানীতে বাঙলা সাহিত্যের দিগ্‌দেশ প্লাবিত হয়ে উঠলো।)

বাঙলা সাহিত্যে এ নূতনত্বের আমদানীর জন্য আলাওলের কৃতিত্ব তাঁর যুগের কোন কবির চেয়ে কম নয়, বরং সমধিক। তিনি আরকানরাজ থদো মিন্তারের রাজ্যকালে খুব সম্ভব ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেন। সূফী কবি মালিক মহম্মদ জৈসীর হিন্দী কাব্য 'পদুমাবৎ' এর ভাবাত্মক অনুবাদ আলাওলের পদ্মাবতী। সাধারণত অনুবাদ বলতে আমরা যা বুঝি পদ্মাবতী ঠিক তা নয়। আলাওলের প্রতিভার ছাপ এ অনুবাদেও সুস্পষ্ট। কাব্য সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনের তাগিদে যেমন তিনি মূলের বহু কিছু বর্জন করেছেন তেমনি তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভায় বহু কিছু সংযোজনও

করেছেন। অনুবাদ হওয়া সত্ত্বেও তাতেই এ কাব্য হয়েছে রসোত্তীর্ণ। পদ্মাবতী আলাওলের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, তাঁর masterpiece. এ থেকে মনে হয় এ কাব্যই তাঁর সর্বপ্রথম রচনা নয়, এর আগেও তিনি কাব্য চর্চা করে হাত পাকিয়ে থাকবেন তাঁর নিজের উক্তি 'রচিলুঁ পুস্তক বহু নানা আলা ঝালা,' থেকে ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে তিনি পদ্মাবতী লিখবার পূর্বে (কিংবা তাঁর নামে প্রচলিত রচনা গুলো ছাড়াও) আরও কোন কাব্য লিখে থাকবেন ; সেগুলো হয়ত কালের কুক্ষীগত হয়েছে, আজ আর সেগুলোর উদ্ধারেরও উপায় নাই। নইলে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য পদ্মাবতীকে প্রথম রচনা বলে মেনে নিতে সাধারণ বুদ্ধিতে খটকা লাগে।

পদ্মাবতীর আখ্যান ভাগ প্রেম ধর্মী। আলাউদ্দীন খিলজীর পদ্মিনী হরণ কাহিনী এর অঙ্গীভূত। তাই বলে এখানে ইতিহাসের সত্য সন্ধান করা উচিত হবে না ; ইতিহাসের দুই একটি নাম নিয়ে কবি বর্ণবহুল গল্পের সাহায্যে মানব জীবনের নানা রসের সন্ধান দিয়েছেন। বিবাহ, মিলন ও বিরহ, অভিযান ও অভিসার এই কাব্যের মুখ্যরস সৃষ্টি করেছে। মানুষের হৃদয় রাজ্যের সংবাদ রসাত্মক বাক্যে আমরা তাঁর এ কাব্যে যথাযথ ভাবে পাই। কাব্যের বিষয় বস্তুতে যে যুগে দেব দেবীদের ছড়াছড়ি, সে যুগে আলাওলের কাব্যে মানুষের জীবন রহস্যের সংবাদে আমরা কম বিস্মিত হই নাই।

পদ্মাবতীর আখ্যানভাগ এ রকম। চিতোর রাজ রত্নসেন নাগমতীকে বিবাহ করেছেন ; সুখস্বচ্ছন্দে তাঁদের দিন যাচ্ছে. এমন সময় একদিন তিনি এক শুকপাখী কিনলেন। শুকপাখীর মুখে সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর অতুলনীয় রূপগুণের কাহিনী শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। প্রেমিকা স্ত্রী নাগমতী, রাজ্য, রাজধানী, জীবনের সুখ সবকিছু বিসর্জন দিয়ে যোগীবেশে তিনি সিংহলের পথে বেরিয়ে পড়লেন ; পথে অনেক দুঃখ কষ্ট তাঁকে সইতে হলো। শেষ পর্যন্ত সিংহলে পৌঁছে নানা অসাধ্য সাধন করে তিনি

লাভ করলেন বাঞ্ছিতা পদ্মাবতীকে। শ্বশুর বাড়ীতে মহাসুখে তাঁর দিন কাটতে লাগলো।

এমন সময় এক পাখীর মুখে তাঁর পূর্ব স্ত্রী নাগমতীর মর্মন্তুদ বিরহ দুঃখ-দশার কাহিনী শুনতে পেয়ে রত্নসেন পদ্মাবতীকে নিয়ে স্বদেশ যাত্রা করলেন। পথের দুঃখ এবারেও বাদ গেলনা। অবশেষে পদ্মাবতীসহ স্বীয় রাজধানীতে পৌঁছলেন।

এবারে আর এক অঘটন ঘটলো। রত্নসেনের সভায় এক জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। একবার কোন কাজের জন্য বিরাগভাজন হলে রাজা তাঁকে তাঁর রাজ্য থেকে বের করে দেন। তাঁর যাবার সময় পদ্মাবতী তাঁকে তাঁর একগাছি কঙ্কণ উপহার দেন। এই কঙ্কণই পদ্মাবতীর কাল হয়ে দাঁড়ায়।

ব্রাহ্মণ দিল্লীতে গিয়ে বাদশাহকে সেই কঙ্কণখানা দেখিয়ে পদ্মাবতীর রূপ ও গুণের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। আলাউদ্দীনকে রূপের নেশা পেয়ে বসলো। তিনি দূত পাঠালেন চিতোরে. রত্নসেনকে হুকুম দিলেন পদ্মাবতীকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দিতে। রত্নসেন ক্রোধে ও ঘৃণায় এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ক্রোধে বাদশাহ আলাউদ্দীনের মেজাজ বিগড়ে গেল। তিনি চিতোর আক্রমণ করলেন। সুদীর্ঘ বার বছর ধরে যুদ্ধ চললো। অবশেষে রত্নসেন পরাজিত ও বন্দী হলেন।

গোরা বাদল নামে দুই ভক্ত অনুচরের কূট-কৌশলে রত্নসেন কারামুক্ত হলেন। রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে পদ্মাবতীকে নিয়ে পরম সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। এমন সময় দেবপাল নামে এক রাজার সঙ্গে রত্নসেনের যুদ্ধ বাধলো। এই যুদ্ধে রত্নসেন আহত হয়ে কিছুদিন পরে প্রাণত্যাগ করলেন। নাগমতী ও পদ্মাবতী দুই রাণীই সহমৃতা হলেন। এদিকে আলাউদ্দীন আবার চিতোর আক্রমণ করলেন। নগরে প্রবেশ করেই দেখলেন যাঁর জন্য উন্মত্ত হয়ে এত লোকের প্রাণসংহার করলেন তিনি আর ইহ জগতে নাই, তাঁর চিতাধূম আকাশে উড়ছে। চিতাধূমে সালাম জানিয়ে আলাউদ্দীন ভগ্ন মনে

দিল্লীর পথে ফিরে গেলেন।

এ কাব্যে অদ্ভুত রূপকের সমাবেশ হয়েছে। আখ্যানবস্তুর অন্তরালে মহনীয় নৈতিক শিক্ষা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। পদ্মাবতী হলেন চির সুন্দরের প্রতীক; রত্নসেন ও আলাউদ্দীন এরা সকলেই লোভ বা লালসার নামান্তর। সুন্দরের আসন মনের পবিত্র মন্দিরে, লালসার মধ্যে সে সুন্দর ধরা দেয়না। তাই রত্নসেন সেই সুন্দরকে ভোগের মধ্যদিয়ে পেতে গিয়ে হারালেন, আর আলাউদ্দীন তার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত এসেই ভগ্ন মনোরথ হয়ে ফিরলেন। রেখে গেলেন সেই মহনীয় সুন্দরের উদ্দেশে তাঁর অন্তরের অকুণ্ঠ প্রণতি। জৈসী এবং আলাওল উভয়েই রঙ্গীন গল্পের সরতার অন্তরালে এ রূপককে রূপ দিয়েছেন।

আলাওলের এ কব্যে নারীচরিত্রগুলো বাঙালী নারীর স্নেহকোমলতায় ও দোষগুণের সমাবেশে এবং বাঙালী মনের রসসিঞ্চনে সৌন্দর্য সুশোভিত হয়েছে। পদ্মাবতী সিংহল ছেড়ে যখন শ্বশুর বাড়ী চিতোর রওয়ানা হচ্ছেন তখনকার বর্ণনায় হিন্দু মুসলিম বাঙালী মেয়ের শ্বশুর বাড়ী যাবার চিত্রই ফুটে উঠেছে। সখীদের গলাধরে পদ্মাবতীকে ক্রন্দনমুখর অবস্থায় বলতে শুনি—

শুন প্রাণ সখী আমি চলি যাব যথা
তথা গেলে পুনি ফিরি না আসিব এথা।
যেই দিন লাগি সখী মনে ছিল ভীত
সেই দিন আসি আজি হৈল উপস্থিত।

*   *   *

পরদেশী হৈল বলি দয়া না ছাড়িও
অবশ্য বারেক মোরে স্মরণ করিও।
তুমি সব ভাগ্যবতী রহিলা স্বদেশে
মোর মনে রহিলেক এ জনম ক্লেশে।

*　　*　　*

যেই কিছু খিকাধিক বলিল যখনে
দুঃখিনীরে ক্ষমা কর না রাখিও মনে।
দুঃখিনী করিতে মনে হইল বিকল
পদ্মাবতী কান্দনে কান্দেন সখীগণ।

জীবনের বাস্তব চিত্রের সাহায্যে এ হেন করুণ রসের সৃষ্টি সে যুগে বিস্ময়কর। আলাওলের প্রতিভায় তাও সম্ভব হয়েছে।

তাঁর দ্বিতীয় কাব্য সায়ফুল মুল্লুক বদিউজ্জামাল রচিত হয় অনুমানিক ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে; প্রথমার্ধ মাগন ঠাকুরের আদেশে : দ্বিতীয়ার্ধ রাজ অমাত্য সৈয়দ মুসার আদেশে। আলাওল এ কাব্যের আখ্যান ভাগ সংগ্রহ করেছেন সম্ভবতঃ ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে রচিত কবি গহবাছির ঐ নামের উর্দ পুস্তক থেকে। গহবাছী ফারসী আরব্য-উপন্যাস থেকে এ গল্প উর্দুতে এনেছেন।

সয়ফুল মুল্লুক বদিউজ্জামাল একখানা প্রেমকাব্য। কবির নিজের কথায় "প্রেমের পুস্তক এই সয়ফুল মুল্লুক।" এ কাব্যের নায়ক মানুষ, নায়িকা পরী। পরীকথাটা বাদ দিয়ে রেখে মানব মানবীর প্রেম ও প্রণয়জনিত কাব্য হিসাবে ইহা সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য। কাব্যের নায়ক মিশরের বাদশাহ সিফুয়ান পুত্র সয়ফুল মুল্‌ক পরীবালা বদিউজ্জামালের চিত্র দেখে তাকে পাওয়ার জন্যে আত্মহারা ও হতচৈতন্য হয়ে পড়েন। তাঁর বন্ধুর কাছে বাদশাহ একথা অবগত হয়ে পরীবালার সন্ধানে দেশে দেশে লোক পাঠালেন; রাজার কোন চেষ্টাই যখন সফল হলো না তখন বদিউজ্জামাল তার প্রেমিক নাগরকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। সায়ফুল ও তাঁর বন্ধু পরীরাজ্যের উদ্দেশ্যে অভিসার করলেন। পথে নানা অঘটন ঘটে। শেষ পর্যন্ত প্রেমের সাধনা ফুল হয়ে তাদের জীবনে ফুটে উঠে। সায়ফুল পরীবালা বদিউজ্জামালকে আর তার বন্ধু মল্লিকাকে বিবাহ করেন।

হপ্তপয়কর আলাওলের আর একখানা রসরচনা। পারস্যের মহাকবি

নেজামী গঞ্জাবীর রচিত ঐ নামের কাব্যের ভাবানুবাদ, রচিত হয় ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে। ইহা সাতটি 'পয়কর' বা গল্পের সমষ্টি। হপ্তপয়করের আখ্যানভাগ এরূপ :—

"আরব ও আজমের অধিপতি নোমানের পুত্র বাহরাম এক জ্যোতিষীর উপদেশে য়্যামান দেশে আপণ মঙ্গল কামনায় বাস করছিলেন; তার সাথী ছিলেন এক শিল্পী, তিনি এক গৃহের মধ্যে এক রঙ্গের একটি করিয়া সাতটি টঙ্গী তৈরী করেন। মৃগায় আর বিলাসে রাজপুত্রের দিন কাটে। ওদিকে তার পিতা গেলেন মারা। পুত্র রাজ্যের বাহিরে এই সুযোগে মন্ত্রী সমস্ত দখল করে রাজা হয়ে বসেন। রাজ্য জয় করে সাত রাজ্যের অনিন্দ সুন্দরী সাত কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন ও প্রত্যেককে এক একটি টঙ্গীতে রাখেন। এই সাতরাণী থেকেই হপ্ত পয়করের উদ্ভব। রাজার সাতরাণী সাত রাত্রিতে রাজাকে তাঁদের নিজ প্রাসাদে গল্পগুলি শোনায়।" এ প্রসঙ্গে কবির এ উক্তি স্মরণীয়—

আনন্দ উৎসবে যে দিন যে গৃহে যায়
সবে পরে সেই বর্ণবাস ॥
নৃত্যগীতে অবশেষে গোঁয়াইলা কেলিরসে
শয়ন সময় বাহরাম।
কহে রাজকন্যা প্রতি শুন শুন গুণবতী
কহ এক প্রসঙ্গ উপাম।
এই মতে সপ্তরাতি সপ্তবিজ্ঞ কলাবতী
কহিলেক সপ্ত সুপ্রসঙ্গ।
এই পুস্তকের সূত্র শুন শুন সাধুপুত্র
রসসিন্ধু অমিয় তরঙ্গ ॥

আলাওলের চতুর্থকাব্য তোহফা, রচিত হয় ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে। তোহফায় ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে নানা তত্ত্বকথা কবি তাঁর সরস লেখনীর সাহায্যে হৃদয়-

গ্রাহী করে তুলেছেন। গ্রন্থখানিতে ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত এবং মুসলিম জীবনে পালনীয় অনেক ইঙ্গিত রয়েছে। ইহাও ফারসী কবি ইউসুফ গাদার চরিত ঐ নামীয় পুস্তকের ভাবানুবাদ।

আলাওলের অপর গ্রন্থ 'সেকেন্দার নামা' কবি নেজামীর ফারসী সিকেন্দার নামা অবলম্বনে ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। এই গ্রন্থে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় কাহিনী ও করুণ পরিণাম দেখানো হয়েছে। ভাবানুবাদ হলেও এ গ্রন্থে আলাওলের পাণ্ডিত্য ও গম্ভীর জ্ঞানের সুস্পষ্ট পরিচয় পাই।

সম্ভবত তিনি আরও কিছু কাব্য লিখেছিলেন। সে সবের নাম আমরা জানিনা। জানার সম্ভাবনাও নাই। কাব্যগ্রন্থগুলো ছাড়াও সে যুগের সাহিত্যিক রেওয়াজ অনুসারে তিনি বহু বৈষ্ণব খণ্ডগীতি বা পদাবলী রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত পদাবলী অধিকাংশই মধুর রসের।

আলাওল আরবী, ফারসী, উর্দু, বাঙলা ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। এতগুলো ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন সে যুগে সহজ কথা নয়। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যেই তাঁর যথার্থ পাণ্ডিত্য এবং হিন্দুমুসলিম জীবন সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে। কবি জীবিকা অর্জনের জন্যে রোসাঙ্গ রাজদরবারে সৈনিকের চাকুরী নিয়েছিলেন।

বৃত্তি হিসাবে অসির চর্চা করলেও প্রাণমনের ক্ষুধা মিটাতে এবং সৃষ্টির আবেগে তাঁকে জ্ঞান ও ভাবের রাজ্যে প্রেমিকের মতো বিচরণ করতে দেখি। তাঁর সাধনা আমাদের যুগের শিক্ষিত মুসলমান সাহিত্যিকদের আদর্শ হওয়া উচিত। সাহিত্যিক জীবনের দুর্লভ সাধনায় তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে Posterityর জন্য কবি অনন্ত মধুচক্র রচনা করে গেছেন। আমাদের কালের বিদ্রোহী নজরুলের মতো তিনিও সৈনিক কবি। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেদিক থেকে আলাওলই প্রথম এই সম্মানের অধিকারী।

আলাওলের কাব্যের আখ্যান বস্তুতে মৌলিকতার অভাব আছে, কেননা সেকালের কোন কাব্যেই আখ্যান বস্তু মৌলিক নয় কিন্তু ভাব-প্রকাশে, রূপ বর্ণনায়, ভাষা ও ছন্দ নির্মানে এবং অলঙ্কার নিরূপণে কবিবরের অপরূপ প্রতিভার ও অনুপম স্বকীয়তার ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁর রচিত একটি রূপের বর্ণনা এরূপ—

সুন্দরী কামিনী কাম বিমোহে।
খঞ্জন গঞ্জন নয়ন চাহে॥
মদন ধনুক ভুরু বিভঙ্গে।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে বান তরঙ্গে॥
নাসা খগপতি নহে সমতুল।
সুরঙ্গ অধর বাঁধুলি ফুল॥
দশন মুকুতা বিজলী হাসি।
অমিয় বরিষে আঁধার নাশি॥
উরজ কঠিন হেম কটোর
হেরি মুনি মন বিভোর।
হরি-হরিকুম্ভ কটিনিতম্ব।
রাজহংস জিনি গতি বিলম্ব॥ (পদ্মাবতী)

তাঁর ছন্দ রচনায় দক্ষতার নমুনা—

অনঙ্গ সঞ্চার অঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গে
আমোদিত পদ্মগন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে॥

এ সব পড়লে তাঁর ছন্দ নৈপুণ্যে বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়। ভাষা ও ছন্দের দিক থেকে বিচার করলে আলাওল শুধু মধ্যযুগের নন, সর্বকালের বাঙলা সাহিত্যে এক মহাবিস্ময়কর প্রতিভা।

দুর্ভাগ্য এ দেশের যে এত বড় মহাকবিকেও তার শেষ জীবনে চরম দারিদ্র ও দুঃখের কষাঘাত সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর কাব্যে তাই সেদিন

এমনি এক বুক ফাটা হাহাকার ধ্বনিত হয়েছিল।

মন্দকৃতি ভিক্ষা বৃত্তি জীবন কর্কশ।
পুত্রহারা সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ॥

এখানেই প্রশ্ন জাগে খোদা বাঙলার কবিদের উপরে একি অভিশাপ দিয়ে রেখেছেন? আলাওলের শেষ দিনগুলোর কথা স্মরণ করলে বাঙলার মধুসূদন, হেমচন্দ্র আর নজরুলের কথা মনে পড়ে।

ইমরোজ,
মাঘ, ১৩৫৭।

মানুষের প্রেম ও কবি আলাওল

মুসলমানদের ঘরেই বাঙলা সাহিত্যের জন্ম, তার লালন পালন ও বৃদ্ধি। বাঙালী মুসলমানের অর্থাৎ এদেশের মাটির মানুষের সাহিত্য সাধনার একটা যে বিরাট ধারা ছিল দুই শতাব্দীর ব্যবধানে আমরা আমাদের সেই সাহিত্যের সঙ্গে আজ যোগবিচ্ছিন্ন। (নূতন আলোকে আমাদের অতীত ঐতিহ্যের মূল্য নিরূপিত হওয়া উচিত এবং তার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে ভবিষ্যৎ চলার পথ তৈরী করার জন্য সুসংবদ্ধ পরিকল্পনাও রচিত হওয়া উচিত. কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের তরফ থেকে তেমন কোন প্রয়াস হল না। মুসলিম গণমানসের ধারক ও বাহকরূপে যে বিরাট সাহিত্য আমাদের ছিল বৃটিশ আমলের সাহিত্যিকদের কৃপাকটাক্ষে তা বটতলায় নির্বাসিত হয়ে গেছে। আধুনিক কালের হিন্দু সাহিত্যিক ও সমালোচকদের বদৌলতে মধ্যযুগের যে বাঙালী কবিদের পরিচয় আমরা পাচ্ছি তাঁরা অধিকাংশই হিন্দু। সে যুগের হিন্দু সাহিত্য সাধকদের খোঁজ করতে গিয়ে যে সব মুসলমান কবির নাম তাদের চোখের সামনে পড়েছে তাঁরা তাদের তালিকাভুক্ত করেছেন স্বীকার করি; ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের গুণ গ্রহণও করতে দেখি এমন কি মুসলমান নবাব বাদশাহ, আমীর ওমরাহদের বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপার নিয়ে তাদের সকৃতজ্ঞ প্রশংসাও করতে শুনি কিন্তু যে অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণামূলক দৃষ্টি ভঙ্গীর সাহায্যে তাদের প্রাচীন গৌরবজনক কীর্তি কথা উদ্ধার করে বাঙালী হিন্দু উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে তার জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব দাঁড় করাতে চেয়েছেন, তার অবচেতন মনে তা'ই তাকে প্রেরণা দিয়েছে মুসলিম গৌরবগাথার কথা পারত পক্ষে চেপে যেতে। মুসলমানেরাও উক্ত সময়ে শিক্ষা দীক্ষা এবং সাহিত্যিক রস ও রুচিবোধের অভাবে গবেষণার পথে

এগোতে চাননি। এ কারণে মধ্যযুগের বাঙালী সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানি তা প্রধানতঃ হিন্দুদের কাছ থেকেই। তাঁরাই আমাদের জানালেন আলাওল নামে একজন বড় কবি ছিলেন। অবশ্য একথা সত্য যে অধুনা আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ কয়েকজন বাঙলা সাহিত্য দরদী মুসলিম মনিষী কবি আলাওল সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। কিন্তু তার সমগ্র কবি কীর্তির যথাযথ সমালোচনা ও মূল্য নিরূপণ এখনও হলো না।

আলাওল সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে আরাকান রাজ সভায় বাঙলার চর্চা করেছিলেন। আরাকান তখন বৃহত্তর বাঙলা দেশেরই অংশ। এ দেশেও সাহিত্যের তখন মধ্যযুগ। (সেকালের হিন্দু গণমানস রাজনৈতিক পরাজয় বরণ করে সেখান থেকে মুক্তির জন্যই হোক কিংবা তার শক্তির উদ্বোধন করার জন্যই হোক শক্তিশালী লৌকিক দেবতাদের পূজা অর্চনাই করেছে। তখনকার দিনের বাঙলা সাহিত্যে তাই দেখি স্বেচ্ছাচারী দেবদেবীদের প্রাধান্য, রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণনার মধ্যদিয়ে আত্মনিবেদন ও আত্মরতির কাহিনী। হিন্দু কবিদের রচিত সাহিত্যে কল্পনা ও ভাবনা চিন্তার দৈন্য দেখি আর দেখি ধর্মাধর্মের চর্চা করে নিতান্ত অবাস্তবতার ভেতর দিয়ে বাঙালীকে জীবন কাটাতে। যাঁরা যুগকে স্বীকার করেও যুগাতীত মহিমাভিষিক্ত হন কবি বা স্রষ্টা হিসেবে শিল্প জগতে তাঁরা নিশ্চয় বড়। আলাওল যুগের প্রভাব অস্বীকার করলেন না। মুসলমানরা ততদিনে পারসী কাব্যের সাধনার ভেতর দিয়ে বাঙলা সাহিত্যে কাহিনী বা গাথা রচনার সূত্রপাত করেন। পরীর কাহিন, আপেল রাঙ্গা ঠোঁট ও গোলাপী গালের উপর কালো তিলের খবর এ দেশের মাটিতে ছড়িয়ে তারা এ দেশের মনকেও উতলা করে দিলেন। আলাওল দেশের রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে কাব্য চর্চা করতে গিয়ে তার কাব্যের কাঠামো হিসেবে হিন্দু ও মুসলিম সাধনার বাইরের দিকটাকে বাদ দিতে পারলেন না। পদ্মাবতী নাম দিয়ে মালিক মুহম্মদ

জৈসীর পদ্মাবৎ কাব্যের তিনি অনুবাদ করিলেন, দৌলত কাজীর লোর-চন্দ্রানীর অবশিষ্টাংশ রচনা করে দিলেন। তাঁর হাতে পারসী কাব্যের সুখপাঠ্য কাহিনী সাইফুল মুল্লুক বদি-উজ্জামাল বাঙলারূপ ধারন করলো, তিনি রচনা করলেন সপ্তপয়কর ও ইস্‌কানদারনামা। পরিচিত পথেই প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরব্যাপী তাঁকে সাহিত্য সাধক শিল্পীর জীবন যাপন করতে দেখি অথচ ভাবলে বিস্মিত হয়ে যাই মধ্যযুগের বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিকতার মধ্যে মানুষের জীবন রহস্য সম্বন্ধে কাল ও যুগজয়ী এত গভীর চিরন্তন সত্যের সন্ধান তিনি পেলেন কোথা থেকে ?

সে যুগের সাহিত্যে দেখছি মানুষ নেই আছে শুধু ধর্ম ও দেবতার কাহিনী কিন্তু তিনি ধর্মাবেগ প্লাবিত দেশে মানব জীবনের জন্মমৃত্যু সুখ দুঃখ বিবাহাদি উৎসব ও মিলন বিরহ জনিত আনন্দ বেদনার কথা অসাধারণ কবি দৃষ্টিতে তাঁর কাব্যে ধরে দিয়ে গেছেন। হতে পারে যুগ প্রভাবের বশে বাহ্যতঃ তিনি নিজের দেশের বর্ণনা করছেন না কিন্তু মিলন বিরহের যে ছবি তিনি ফোটাচ্ছেন তা যে সম্পূর্ণ বাঙলাদেশ থেকেই সংগ্রহ করেছেন একথা অস্বীকার করার যো নেই। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য পদ্মাবতীতে দেখতে পাই রত্নসেন পদ্মাবতীকে বিবাহ করে সস্ত্রীক তার নিজের দেশ চিতোর প্রত্যাবর্তন করছেন। সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতী কোন দিন স্বদেশ, স্বীয় পরিবেশ, আত্মীয় স্বজন ও সখীদের ছেড়ে কোথাও পা বাড়ান নি ; স্বামী সঙ্গে এই তার প্রথম বিদেশ যাত্রা। বিবাহ নারী জীবনের ধর্ম। মনোমতো বিবাহে এবং বিবাহের পর স্বামী গৃহ গমনে নারী মন ভেতরে ভেতরে নেচে উঠে না সুস্থ নারী জীবনে এমন দেখা যায় না ; তবু বিবাহের পর পরই বাবার বাড়ীর অতি পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় অনিশ্চিত আশঙ্কায় মেয়েদের প্রাণ কেঁপে উঠে, এমন কি মা বোন এবং সখীরা মিলে তাকে সমবেদনা জানাতে গিয়ে নিজেরাও অশ্রু সংবরণ করতে পারেন না। বাঙলা দেশের এতো নিত্য কালের ছবি ! পূর্ব বাঙলার কবি

আলাওল সিংহলী পদ্মাবতীকে পতিসঙ্গে চিতোরে শ্বশুরালয়ে পাঠাতে গিয়ে নিজেও কেঁদেছেন, আত্মীয় স্বজন ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকলের চোখেই অশ্রুর বন্যা বইয়েছেন :—

গমনের কাল যদি নিকট হইল
পদ্মাবতী সব সখীগণ আনাইল
কন্যা ঘরে সিংহলের রমণী আসিয়া
কাঁদিতে লাগিল সব শোকাকুলী হৈয়া।
একে একে গলা ধরে কান্দে বরবালা
সকল ছাড়িয়া আমি যাইব একেলা।

* * *

ছাড়িয়া নাইয়র ঘর বান্ধব সমাজ
একসরী হইয়া চলিলোঁ ভিন্নরাজ।
তোমরা সবেরে কোনমতে পাসরিব
স্মরণ হইলে মনে জ্বলিয়া মরিব।

* * *

যেই দিন লাগিয়া সখী মনে ছিল ভীত
সেই দিন আসি আজি হৈল উপস্থিত

* * *

পরদেশী হৈল বলি দয়া না ছাড়িও
অবশ্য বারেক মোরে স্মরণ করিও।

* * *

তুমি সব ভাগ্যবতী রহিলা স্বদেশে
মোর মনে রহিলেক এজনম ক্লেশ।
আশীর্বাদ আমারে করিও একমনে
সদত পীরিতি যেন থাকে স্বামী সনে।

যেই কিছু ধিকাধিক বলিল যখনে
দুঃখিনীরে ক্ষমা কর না রাখিও মনে।

এ থেকে সহজেই বোঝা যায় কত বড় সমবেদনশীল হৃদয় দিয়ে কবি এ করুণ দৃশ্য এঁকেছেন। জীবনমুখী এ বাস্তব দৃষ্টি মধ্য যুগের বাঙলা কাব্য আলাওলের আগে কি পরে আর দেখি না।

(মানুষের জন্য কাহিনী রচনা করতে গিয়ে মানব জীবনের কুহকময় বৃত্তি প্রেমকে আলাওল তাঁর কাব্য থেকে বাদ দিতে পারেন নি।) এমন অনেক রক্ষণশীল মানুষ আছেন যাঁরা ভেতরে ভেতরে প্রেমের প্রভাব স্বীকার করেও প্রেমঘটিত আলাপ আলোচনায় 'রস কথা শুনিতে বিরস হ'য়ে যান' আলাওল তাঁদের কথা ভাবেন নি। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রেমিক ও রসিক কবি। এ আমরা বুঝতে পারি তাঁর কাব্য থেকে; কারণ এতো জানা কথা "কাবরে পাইবে কবির জীবন বাণীতে।" তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেম গাথা সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তি :—

'প্রেমের পুস্তক এই সয়ফুল মুল্লুক
নানা অপরূপ কথা বিধির কৌতুক।

*   *   *

কিংবা—প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হস্তে বশ।

সায়ফল মুল্লুক 'মিশ্র' (সম্ভবতঃ) মিশর দেশের বাদশাহ শাহা সিফুয়ানের ছেলে। সৌভাগ্যক্রমে ইরম বোস্তানের পরীরাজা শাহাপালের মেয়ের রূপ সে দেখে ছবিতে। প্রেমের গতি ও প্রভাব অনিবার্য; প্রেমেতে মজিলে মন মানুষ আর পরীতেই বা কি পার্থক্য। সুতরাং চিত্র পটে আঁকা ললিত মধুর রূপলাবণ্য দেখে সায়ফুল মুল্লুক মোহ গেল। কিন্তু কোথায় পাওয়া যায় সে কন্যাকে? সে যে তার মানস সরোবরের অগম্য তীরে বাস করছে? রাজপুত্র অভিযান করলো, মানসিক অভিসার নয়; শারীরিক

অভিযান। কত নদ-নদী, নগর গ্রাম, বন উপবন, পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে, সঙ্গের সাথী লোকলস্কর; বন্ধু বান্ধবদের হারিয়ে কত বিপদ বরণ করে, রাজপুত্র উপস্থিত হ'লো কুলস্থম পরীর দেশে—অজানা এক সাগর দ্বীপে। সেখানে দেখলো সরন্দ্বীপে সামন্ত-কন্যা মল্লিকা কুলস্থম পরীর ছেলের হাতে বন্দিনী। কুলস্থম পরীর ছেলেকে মেরে সে মল্লিকাকে উদ্ধার করলো আর তার কাছ থেকে সংবাদ পেলো তার মানসী-প্রতিমা বদিউজ্জামালের। মল্লিকাদের বাড়ীতে ঘটনাচক্রে বদিউজ্জামালের আসা যাওয়া হয়। একথা শুনে বহু কষ্ট সয়ে অবশেষে সয়ফুল মুল্লুক মল্লিকাকে সঙ্গে নিয়ে সরন্দ্বীপে এসে উঠলো। ক'দিন পর বদিউজ্জামাল মল্লিকাদের বাড়ীতে এলো। মল্লিকা নিভৃতে বদিউজ্জামালকে ডেকে নিয়ে তার রূপের পূজারী সয়ফুলের অভিযান কাহিনী খুঁটিয়ে বর্ণনা করলো। নারী যদি জানতে পারে যে সে উপযুক্ত কোন পুরুষ বরের মানসী, উপরে অস্বীকার করলেও মনের গভীর তলায় তার দোলা লাগে। বদিজ্জামালকে আলাওল পরী বলে বর্ণনা করলেন শুধু যুগের দাবী মেটাতে কিন্তু তাকে আঁকলেন সে চিরন্তনী নারী করে।

—আদি অন্ত কুমারের যত বিবরণ
শুনিল মল্লিকা মুখে হই একমন
বদিউজ্জামালে শুনি হইল মুহিত
তথাপিও লাজে হেতু বলে বিপরিত।
প্রত্যয় না হয় ভগ্নি এসব কথন
এতো দুক্ষ মনুষ্যের রহিছে জীবন।

এসব কথার কিছুক্ষণ পর মানবী বোনের চোখ এড়িয়ে পরী বদি-উজ্জামাল তার নাগর সুপুরুষ সয়ফুলকে এক নজর দেখে নিলো অত্যন্ত সংগোপনে—সন্তর্পণে। দেখে দেখে তার চোখ জুড়িয়ে গেলো, মন ভ'রে 'উঠলো' ফিরে যাবার সময় ধরা পড়লো তার প্রেমিক বর সায়ফুলের

কাছে ; সয়ফুলের জীবনে মানস প্রিয়ার অতর্কিত আবির্ভাবে তার 'তনু মন ধন জীবন যৌবন' সব অবশ হ'য়ে গেলো। প্রেমের আগুনে যে এতদিন সিদ্ধ হয়েছে বাঞ্ছিতাকে পেয়ে মুগ্ধ ভক্তের মতো সেই সয়ফুল তার বন্দনা আরম্ভ করলো :—

চক্ষের পুতলী মোর জীবের জীবন
কদাচিত তুমি বিনে না দেখিয়ে আন।
তুমি সে জীবন সত্য আমি তোমা কায়া
তুমি সে শরীর অঙ্গ আমি তোমা ছায়া
স্মরণ করহো আদ্যে তুমি আমি এক।
অঙ্গ ভিন্ন হয় মাত্র প্রাণ সত্য এক।
জ্ঞান দৃষ্ট আপনা হৃদয় ভাবি চাও
যদি ভিন্ন ভাব হয় বদন লুকাও।

নারী প্রেম মুগ্ধ অসহায় পুরুষের এ কি অদ্ভুত আরতি ! মনে হচ্ছে আলাওলের লেখনী মুখে যেন একালের বাঙলার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সুরদাসের প্রার্থনা শুনতে পাচ্ছি। মুগ্ধ ভক্ত সুরদাসকেও প্রেয়সীকে লক্ষ্য করে বলতে শুনি :—

পবিত্র তুমি নির্মল তুমি, তুমি দেবী তুমি সতী,
অধম পামর কুৎসিত দীন পঙ্কিল আমি অতি।

প্রেমের পরশ মানুষকে কালে কালে এমনি সমৃদ্ধ করেছে ; আলাওলের কাব্যে প্রেমে পরিপুষ্ট এমন মানুষেরই ছবি পাই।

আলাওল কাঁচা বা সস্তা প্রেমের কবি নন, তিনি বিরহেরও কবি। মানুষের জীবনে বিরহ প্রেমেরই নামান্তর। বিরহের আগুনে সিদ্ধ ও শুদ্ধ হয়ে যে প্রেমিক ও প্রেমিকার মিলন হয় তারাই বোঝে প্রাণের বেদনা জীবনকে ; আরও বোঝে মহৎ প্রেম ভোগে নয়, ত্যাগে। সংসারে আমরা তাই দেখি বড় প্রেম শুধু কাছে টানে না, দূরেও ঠেলে ফেলে।

আলাওলের নায়ক নায়িকা সয়ফুলও বদিউজ্জামালের জীবনে আরম্ভ হ'লো অশেষ বিরহের পালা ; দিন যায় মাস যায়, মাসে মাসে বছরও ফিরে আসে তবু উভয়ের মিলনের শুভ লগ্ন আর ঘনায় না।

বহু যুদ্ধের পর প্রতিশোধ পরায়ন কুলসুম পরীর হাত থেকে যখন সয়ফুলকে উদ্ধার করা হ'লো, বিরহিণী বদিউজ্জামালের সখীর কাছ থেকে তখন সযফুল শুনলো তার প্রিয়ার শোক বিগলিত অবস্থার কথা :—

তবে সখী করজোড়ে লাগিল কহিতে
তোমার লাগিয়া বালা অনেক চিন্তিতে,
তেজিল তাম্বূল তৈল ভোজন শয়ন
শয়ন হইলে বালা নিদ্রায় জাগন
অবিরত দহে চিত্ত মাংস নাহি মাসা
অল্প মাত্র আছয় ঘুষিতে দুক্ষ দসা।

এরই সঙ্গে তুলনা করুন রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত কবিতায় বিরহিনী যক্ষবধুর কথা :—

মনিহর্ম্মে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ বেদনা।
মুক্ত বাতায়ণ হ'তে যায় তারে দেখা
শয্যা প্রান্তে লীন-তনু ক্ষীন শশী রেখা
পূর্ব গগনের মূলে যেন অস্ত প্রায়—।

মনে হয় নাকি এখন থেকে তিনশ বছর আগে আলাওলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠধ্বনি শুনতে পাচ্ছি? আলাওল শুধু পূর্ব বাঙলার নন তিনি মুসলমান কবি। (ইসলাম ধর্ম মানুষের জগতে সাম্য মৈত্রীর সন্ধান দিয়েছে আর মানুষ-হিসেবেই মানুষের জীবনের দিকে সহজ দৃষ্টি তুলে ধরতে মানুষকে দিয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা।)(মধ্যযুগের সভ্যতার ইতিহাসে পৃথিবীর বুকে ইসলামের এ দান কালজয়ী। ইসলাম ধর্মাবলম্বী আলাওলের

হাতেই দেবদেবীর লীলাভিনয় পুষ্ট বাঙলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম শুনতে পেলাম মানব-ভাগ্যের শাশ্বত সত্য কাহিনী ;—এ সংসারে শোক আছে, দুঃখ আছে, আর আছে অনন্ত প্রেম এবং অশেষ বিরহ। এজন্যই মধ্য-যুগের বাঙলা কাব্য সাহিত্যে :—

হীন আলাওল বাণী, সুরস পয়ার খানি ; পদে পদে অমৃত সিঞ্চন।

ঢাকা প্রকাশ,
৮৯ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা, ১৩৫৬।

রবীন্দ্র-কাব্যে মানবতা

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি ; কাব্যের মধ্যেই তাঁর মনের শ্রেষ্ঠ অংশের প্রকাশ ; অন্যান্য রচনা তাঁর কাব্যের পরিপূরক। সুতরাং শুধু তাঁর কাব্য বিশ্লেষণ করলেই তাঁর কবি-মনের মূল ধারাটির পরিচয় পাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হবে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার প্রধান ধর্ম তাঁর মানবমুখিতা। প্রাক্-পাকিস্তান যুগের সমগ্র ভারতবর্ষে কালিদাসের পরে রবীন্দ্রনাথের মতো এত বড়ো মানবমুখী কবি-প্রতিভা আর জন্মেছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মানবমুখিতা তাঁর প্রতিভার প্রধান ধর্ম হ'লেও সেখানে একটা ত্রুটি বা দুর্বলতা আছে যার জন্যে তিনি সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলনপূর্ণ, খণ্ড ক্ষুদ্র দোষ-ত্রুটিবহুল মানবের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করতে পারেননি। মর্ত্য মানুষের ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, এবং নিতান্তই সহজ সরল ছোট ছোট দুঃখ-কথার মধ্যে ডুবুরির মতো ডুব দিবার তিনি আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেছেন, অবিরাম ইচ্ছা পোষণ করেছেন কিন্তু শক্তির সক্রিয়তা ধুলোবালিময় পৃথিবীতে যেখানে সাধারণ মানুষ বসবাস করছে সেই দরজার কাছে এসে থেমে গেছে। দরজা খুলে তিনি ঢুকে পড়েন নি, বাইরে থেকে অনুমান ও কল্পনার সাহায্যে আভাসে ও ইংগিতে যতটুকু পেয়েছেন তাই দিয়ে ভিতরের জীবন-যাত্রার চিত্র এঁকেছেন আর মানবতার গান গাইবার চেষ্টা ক'রে গেছেন। দ্বার খুলে মানুষের সংসারের অতি তুচ্ছ ও ভগ্ন অংশের মধ্যে প্রবেশের বিফলতাজনিত বেদনাময় প্রয়াসই তাঁর সারা কবি-জীবনের ইতিহাস। তাঁর এ ব্যর্থতায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেও তিনি মুসড়ে পড়েননি ; সুদূরের পিয়াসী ও idealism-এর পূজারী রবীন্দ্রনাথ তাঁর এ ব্যর্থতায় সৌন্দর্য-সৃষ্টির মায়া-প্রলেপ দিয়ে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছেন। Real ও ideal এর দ্বন্দ্বে তিনি

প্রকৃতিকে মানুষের বিকল্পরূপে দাঁড় করিয়ে, প্রকৃতির মধ্য দিয়েই তিনি মানবসত্তাকে জেনেছেন এবং প্রকৃতি-প্রীতির ভেতর দিয়ে শেষটায় মানব-প্রীতির স্বাদ পেতে চেয়েছেন। তাঁর দেশের সাধারণ মানুষ, কি ব্যক্তি-বিশেষ অতি সাধারণ মহিমায় বিকশিত হয়নি, মানুষ ও প্রকৃতি, খণ্ড ও অখণ্ড, সসীম ও অসীম এক অভাবনীয় সংগীতস্রোতে একাকার হ'য়ে গিয়ে তাঁর অতল-গভীর প্রশান্ত হৃদয়ে সমগ্রতায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। তাঁর কবি-জীবনের এহেন পরিণতিতেই তিনি শান্তি পেয়েছেন সত্য ; কিন্তু এমন-ভাবে জীবন ও জগৎকে যেন তিনি পেতে চাননি। তাঁর দীর্ঘ কবি-জীবনে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুসন্ধান করেছেন, কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, নির্বিশেষ মানুষ-কে পেয়েছেন ; চেয়েছেন প্রেমিককে, পেয়েছেন নির্গুণ প্রেমকে, কামনা করেছেন প্রেয়সী, সচিব, সখী ও প্রিয় শিষ্যা'র মতো স্ত্রীর, পেয়েছেন ভাব-ময় শাশ্বত নারীকে, চিরন্তনীকে। চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যেকার এই অসা-মঞ্জস্যজনিত অতৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষা, আন্দোলন ও অশান্তির বেদনায় শেষ পর্যন্ত দেখি সমগ্র মানবতাবোধের এক অখণ্ড ও পূর্ণ স্বাদরূপে তাঁর কবি-জীবনের সোনার ফসল তাঁর কাব্য মর্ত্যমানব সাধারণকে তিনি উপহার দিয়ে যেতে পেরেছেন। তাঁর ভাবজীবনের পরিণতির এই ইতিহাসের সমর্থনে তাঁর বিভিন্ন কাব্যের সাহায্য নিতে হচ্ছে।

প্রথম বয়সের কাব্য 'কড়ি ও কোমলে' দেখি মানুষের এই পৃথিবী তাঁর অত্যন্ত ভালো লাগছে :

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।

'মানুষের মন চায়, মানুষেরি মন' তাই কবি পৃথিবীর জীবন্ত হৃদয়ে আশ্রয় লাভ ক'রেই বাঁচতে চাইছেন। 'বধূ' কবিতাটিতে দেখি হৃদয়হীন

শহরের কঠিন নিষ্পেষণে নীরব পল্লীর সুকোমল এক বালিকার অন্তরের দুঃখ কবি আপন হৃদয় দিয়ে অনুভব করে তার মৃত্যুতেই তাঁর মহিমাময় শান্তির কথা ভেবেছেন। বৈষ্ণব কবিতাতে মানব সমাজের প্রতি প্রীতি কবির চিত্তে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে! কবির মতে ভক্ত ও ভগবান সংসারকে অতিক্রম করে নেই; বৈষ্ণব কবিদের গানগুলোর এমনি মোহ যে এতে ভক্ত ভগবান ও মানব সমাজ একীভূত হ'য়ে ওঠে। যাঁরা এত বড়ো প্রেমের এহেন প্রকাশকে মানুষের জগৎ থেকে নির্বাসিত ক'রে রাখতে চান আমাদের কবি তাঁদের দলে নন, তাঁরা তাঁর কৃপার পাত্র—

এই প্রেম গীতিহার
গাঁথা হয় নরনারী মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বধূর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে. প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাবো কোথা
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

'যেতে নাহি দিব' কবিতার মূলভাব, জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি। সে আসক্তি আবার বয়ঃপ্রাপ্তেরও নয়; কবির কাছে কবির শিশুকন্যা যেমন পৃথিবীর কাছে মানুষও তেমন শিশু। প্রিয় বিচ্ছেদের এই যে দুঃখ তা শুধু কবির শিশুকন্যার 'যেতে আমি দিবনা তোমায়' ধ্বনিতেই পর্যবসিত থাকেনা;

'এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব।' হায়
তবু যেতে দিতে হয় তবু চ'লে যায়।

জীবজগতের জননী বসুন্ধরাও নিয়ত সন্তানের এ বিয়োগ ব্যথায় উদাস করুণ ও জর্জরিত, তাঁকেও এলোচুলে বসে থাকতে দেখা যায়।

দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া'—

'বসুন্ধরা' কবিতাতে দেখি জীব ও জগৎ কবির চেতনায় এক অখণ্ড আত্মীয়তায় অভিন্ন হ'য়ে ধরা দিয়েছে, তাই তিনি চাইছেন—

নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই
একত্রে করির আস্বাদন, এক হ'য়ে
সকলের সনে।

(সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলনে ভরা মানুষের এই অপূর্ণ জগৎই কবির অত্যন্ত প্রিয়।) স্বর্গের নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও অনাবিল শান্তি কবির কাম্য নয়, ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি কবির অত্যন্ত আপনার ; কারণ এখানে আত্মীয় আছে, মানুষের জন্য মানুষের দরদ ভরা হৃদয় আছে। এখানকার দীনমর্ত্যবাসীর ঘরের মেয়েই কবির বধূ হ'য়ে আসে। তার হৃদয়ের আকুতি ও আবেগ, সোহাগ ও প্রেম স্বর্গের মেনকা, রম্ভা ও উর্বশীদের নেই। তাই কবির মনে হয়, এ ধূলির ধরণীতে 'সুখ অতি সহজ সরল।'

দেশের জনসাধারণের প্রতি অসীম মমতাবোধ থেকে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির জন্ম। মানুষের কবি তাঁর দেশের মানুষের অপরিসীম দুঃখ দুর্দশা, অস্বাস্থ্য ও বেদনাজর্জ্জর অবস্থা দেখে পীড়িত হয়েছেন। দেশের মানুষের যে দুর্ভোগ, তা যতটা তাদের অভাবজনিত নয়, তার বেশী আত্মবিস্মৃতিজনিত। এই সব মূঢ়ম্লান মূকদের নানাবিধ দৈন্যের মধ্যে কবি যদি একটী বারের জন্যও 'স্বর্গ হ'তে আত্মবিশ্বাস উদ্বোধিত ক'রে দিতে পারেন তা হ'লে তাদের দৈন্য তারাই ঘুচিয়ে নিতে পারবে, সেই জন্য কবি কল্পনার মায়াপুরী থেকে তাঁর দেশের জনসাধারণের ব্যথাদীর্ণ সংসারের মাঝখানে নেমে যেতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য এমনি যে এখানেও শুধু

তাঁর জাতির কল্যাণেই নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারলেন না, মনুষ্যত্বের সর্ববিধ কল্যানের জন্য বৃহৎ জীবনের জয়গানই তাঁকে করতে হ'লো।

চিত্রা পর্যন্ত দেখি, মানুষের সংসারকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাবার আকুতি কবির মধ্যে তীব্র কিন্তু সেখানে মানুষ নেই, মানবতাবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চৈতালিতেই প্রথম বারের জন্য ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলির প্রতি শুধু আকাঙ্খা নয়, তাদের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। তাঁর কাব্য ও জীবন এখানে নিতান্ত নিকটতম প্রতিবেশীর মতো পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের নৈকট্য এত বেশী যে কাব্য অনেক সময়ে দৈনন্দিন ঘটনার সামান্য পরিবর্তন মাত্র। তাই তিনি মনে করতে পেরেছেন এ মনুষ্য জন্ম তাঁর দুর্লভ', এ জনমে যা পাওয়া গেলো তার তুলনা নেই, তাই তাঁর কাছে

'দুর্লভ এ ধরণীর শেষতম স্থান
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।

সুতরাং যা পাইনি তাও থাক, যা পেয়েছি তাও
তুচ্ছ ব'লে যা চাইনি তাই মোরে দাও

ক্ষণিকা কাব্যেই কবি একটি বারের জন্য মানুষের লোকালয়ে প্রবেশ করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। জীবনের বিচিত্র ক্ষণের মালিকাই এই ক্ষণিকা। সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, গভীর নিষ্ফলতা ও পরম পরিতৃপ্তি, দীর্ঘ বিরহ ও ক্ষণিক মিলন এই কাব্যে একত্রে বিরাজিত।

রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহে এমন অভিজ্ঞতা বিস্ময়জনক। জীবনকে এখানে তিনি আদর্শায়িত করেন নি; যেমন আছ তেমনি এসো আর কোরোনা সাজ' কিংবা 'সত্যরে লও সহজে' এই দুই বাণীর মধ্যে জীবনকে উপলব্ধি করার সার্থক প্রয়াস তাঁর এই কাব্যে বর্তমান। চাওয়া ও পাওয়ার সামঞ্জস্যের মধ্যে যে সহজ সুখ ও শান্তি আছে যার ফলে মানুষের জীবন এক অননুভূতপূর্ব স্মিতহাস্যে স্নিগ্ধতর হ'য়ে আসে ক্ষণিকায় কবি-জীবনের

সেই আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। 'সেকাল' কবিতাটিতে কালিদাসের কালের নায়িকাদের চিত্র এঁকে তাঁদের অভাবে একালের কবি হিসেবে তিনি মোটেই দুঃখিত নন, বর্তমানের আধুনিকাদের মধ্যেই তাঁদের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁকে বলতে শুনি—

মরবো না ভাই নিপুনিকা
চতুরিকার শোকে,
তাঁরা সবাই অন্য নামে
আছেন মর্ত্যলোকে।

তবে কাল-মাহাত্ম্যে কিছু পরিবর্তন হয়েছে, এই যা; বর্তমানে তাঁরা—

পরেন বটে জুতো মোজা
চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্তা
অন্যদেশীর চালে।

কিন্তু তাঁদের চোখের ভাষাই প্রকাশ ক'রে দেয় যে এঁরাই নামান্তরে সেকালেও ছিলেন। এখানেই কবি ক্ষান্ত হননি। বর্তমানকে পুরো দাম দেবার জন্যে কালিদাসকেও তিনি ডিঙ্গিয়ে গিয়ে বলছেন—

আপাতত এই আনন্দে
গর্বে বেড়াই নেচে
কালিদাস তো নামেই আছেন
আমি আছি বেঁচে।

নামে থাকার চেয়ে বেঁচে থাকার মূল্য অনেক বেশী।

এ আনন্দ পাওয়ার অধিকার বর্তমানের কবির জীবনে খুব স্বাভাবিক কারণ বর্তমানের স্বাদ-গন্ধ উজান বেয়ে অতীতে কিছুতেই যেতে পারেনা কিন্তু অতীতের আস্বাদ পাওয়া বেঁচে আছেন ব'লেই কবির পক্ষে সম্ভব, কিন্তু

আমার কালের বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে,
ছিলনা তাঁর ছবি।

অত্যন্ত কৌশলে বর্তমানের 'বিনোদিনী'কে কালিদাসের রমণীদের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিয়ে তাঁর জয় ঘোষণা করা হ'য়েছে, তাতে অতীতের উপরে বর্তমানেরই জয় ; কাব্যের উপরে জীবনের জয়।

এর পরে 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি কাব্য। এগুলোতে ইতিহাস রসের ভেতর দিয়ে কবি অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। (এবং অতীত-কালের ভারতবর্ষের মানবতার যা কিছু সারবস্তু পেয়েছেন, তার সৌন্দর্য-সাধনা ও আধ্যাত্মিকতা-প্রীতি ইত্যাদি থেকে রস ছেকে নিয়ে এসে একালের মানুষকে তারই সাথে যুক্ত ক'রে মহনীয়তা ও পূর্ণতা দান করতে চেয়েছেন।) মানুষের জীবন রবীন্দ্রনাথের সাধনার বিষয় কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কোথাও তাঁর কাব্যে তা সিদ্ধি-বিমণ্ডিত হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু মানুষের জীবন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের জন্য কবি যে কত প্রয়াসই না করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কখনো বর্তমানের সিংহদ্বার দিয়ে, কখনো ইতিহাসের পরিখা উত্তীর্ণ হ'য়ে আবার কখনো বা ভগবৎ প্রেমের আকাশ-পথে। আত্মজীবনের জীবনদেবতার উপলব্ধিতে মানুষের জীবনে প্রবেশের প্রয়াস, বিশ্বদেবতার সার্বজনীন অনুভূতিতেও সেই একই কথা। নারীর জীবন, শিশুর জীবন, প্রকৃতির জীবন সকল প্রয়াসেই তাঁর সেই দুর্গমতম রহস্য-লোকে প্রবেশের এই নিষ্ফল প্রচেষ্টা। জীবনকে তিনি জাগতিক রীতি অনুসারে যথাযথ না দেখে সৌন্দর্যে আদর্শায়িত ক'রে দেখেছেন, তার রহস্য এই প্রবেশের ব্যর্থতায়। এ দিক থেকে 'উৎসর্গ' কাব্যখানি কবি মনের এক অপরূপ সৃষ্টি। মানুষের পরিপূর্ণ পরিচয় না পাওয়ার বেদনা এবং পরিচয় পাওয়া গেল না ব'লেই সারা জীবন সেই মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন এ দুইয়ের ছবি উৎসর্গ কাব্যে অত্যন্ত সুপরিস্ফুট। কবিকে

যখন বলতে শুনি—

যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই
যাহা পাই তাহা চাইনা,

কিংবা পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম।

তখন বুঝিতে বাকী থাকেনা কবি-প্রাণের কিসের এ আবেগ।

এর পরে কবির শ্রেষ্ঠকাব্য 'বলাকা'। বলাকা রচনার পূর্বে কবি ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমন করে এসেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য ইউরোপ তখন তৈরী হচ্ছে। সেখানে তিনি দেখেছেন মানুষ কি কর্ম-ব্যস্ততার ভেতর দিয়ে ঘন কালো মেঘের মতো কোন অজানার দিকে দ্রুত ছুটে চলেছে। মনুষ্য-জীবনের এই ব্যস্ততা ও গতি তাঁকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে। ফরাসী দার্শনিক বের্গস্‌র গতিবাদের শিষ্য ইউরোপ; কিন্তু প্রাচ্যের কবি গতিবাদে মুগ্ধ হ'লেও শুধু গতিকেই মুখ্য ব'লে গ্রহণ করতে পারেননি। বিরাট বিশ্বের মানুষ এভাবে যে অবিরাম 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথ', অন্য কোন খানে, ছুটে চলেছে তাদের এ চলা একদিন বিশ্বনাথের সঙ্গে গভীর প্রেম ও পরিপূর্ণ মিলনে সার্থক হ'য়ে উঠবে; মানবস্রোতের এই যে—

হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল, চলে নিরবধি।'

এর 'অকারণ' 'অবারণ চলা' একদিন কোন প্রেমমন্ত্রের স্পর্শে বিশ্বাত্ম-বোধের পরিপূর্ণতায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে। সেখানে মানুষ ও জগৎ, মনুষ্যাত্মা ও বিশ্বাত্মা একাকার হ'য়ে যাবে। বলাকা কাব্য রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের পরিণত ফল, তাঁর কাব্য-সাধনা ও কাব্যানুভূতির পরিণাম;

জীবন ও জগতের সমগ্র সংগীতস্রোত ; মানবতা-বোধের পরিপূর্ণতার অমৃত রস।

এর পরের কাব্যগুলোতে আর নূতনত্ব দেখি না। পূর্বের অনুভূতিরই 'ইংগিতে আর ভংগীতে' নানাবিধ প্রকাশ। জন্মদিনে, আরোগ্য, গল্পসল্প প্রভৃতি শেষ জীবনের কাব্যগুলোতে মানবতাবোধের এ প্রকাশ অবশ্য অত্যন্ত সহজ ও সুন্দর। জীবন-মধ্যাহ্নে কবি উপলব্ধি ক'রেছিলেন কেবল মানুষ হিসেবেই যে মানুষের চিরন্তণ মহিমা, উত্তম-অধম নির্বিশেষে যে কাহিনী, তার জীবনের সত্যকার ইতিহাস ; সেই প্রতিদিনের হাসিকান্না, সুখদুঃখই ধরণীকে চিরশ্যামল ক'রে রেখেছে, তারই যে গান তাই শাশ্বত, তাই অমর নইলে যখন—

কুরু পাণ্ডব মুছে গেছে সব,
সে রণরঙ্গ হ'য়েছে নীরব,
সে চিতা বহ্নি অতি ভৈরব
ভস্মও নাহি তার।
যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি,
সে আজি কাহার তাহাও না জানি,
কোথা ছিল রাজা, কোথা রাজধানী
চিহ্ন নাহিক আর।

তখনও শুধু যে টুকু আছে তা—

যুগে যুগে লোক গিয়েছে এসেছে,
দুখীরা কেঁদেছে, সুখীরা হেসেছে,
প্রেমিক যে জন ভাল সে বেসেছে,
আজি আমাদেরি মত ;
তারা গেছে, শুধু তাহাদের গান—
দুহাতে ছড়ায়ে ক'রে গেছে দান ;

দেশে দেশে তার নাহি পরিমাণ
ভেসে ভেসে যায় কত !

এর সঙ্গে তাঁর শেষ জীবনের কাব্যগুলো মিলিয়ে পড়্‌লে সেখানে তাঁর জীবন-শেষের অন্তরভরা হাহাকারই শুন্‌তে পাই—

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু,
রয়ে গেল অগোচরে।'

মানুষের বিশাল বিশ্বের, আয়োজন সর্বাঙ্গীণরূপে জানা গেল না, তবে কবির সান্ত্বনা এই ভেবে যে যেখানে—

চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল,—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

* * *

মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকল রবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগান্তর হ'তে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড় ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।

ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।

(এ পথ ধরেই শেষ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ 'নারায়নী ধরণীর ধুলো'য় মানব সাধারণের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।) বিশেষ মানুষ, কি ব্যক্তি বিশিষের গান নাইবা পেলাম তাঁর কাছ থেকে ; কিন্তু গণ-তান্ত্রিক আধুনিক জগতে এককালের অবহেলিত লাঞ্ছিত মানুষ যে জেগে উঠছে. আপন আপন তুচ্ছ পরিচিত গণ্ডীর অতি তুচ্ছ কাজকর্মের ভেতর দিয়েই যে তারা সমগ্রভাবে পৃথিবীতে বেঁচে আছে ও ভবিষ্যতে থাকবে এ আশ্বাস ও এহেন শান্তি পেয়ে কবি মর্ত্যলোককে প্রণাম করে গেছেন।

তাহ্‌জীব,
১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

নজরুল প্রতিভার বৈশিষ্ট্য

(অদ্ভুত এই বাংলা দেশ। তার চেয়ে বেশী অদ্ভুত এ দেশের প্রকৃতি। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশগুলোর তুলনায় বাংলার বিচার করলে এদেশের মাটি আর আবহাওয়ার যেমন বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে তেমন আর কোন প্রদেশের নাই। নদীমাতৃক পূর্ববাংলার নদী-নালা খাল-বিল যেমন তাকে রমণীয়তা দান করেছে তার চেয়ে বেশী করেছে সে অঞ্চলের মাটি ও আলোবাতাসকে সিক্ত। সেখানকার সিক্ত পরিবেশে এমন একটা স্নিগ্ধ জড়িমাজড়িত ভাব রয়েছে যে সাধারণ মানুষও সেখানে ভাবমন্থর হোয়ে ওঠে। নদীর বাঁক, তার আঁকাবাঁকা গতি, স্রোতের টান, পদ্মার চর, চরের বালু কাশবন, তার ধব্‌ধবে শাদা ফুল, চরের মাঝে এখানে সেখানে মানুষের বাড়ী-ঘর, আর সবার উপরে গোরুর গাড়ীর গতিতে চলা মানুষের জীবন এ-সবই ভক্তির ও কাব্যের উপাদান জুগিয়ে এসেছে আর পশ্চিম বাংলার ফাঁকা মাঠ, তাল আর খেজুর গাছের সারি তার কিছুটা শুকনো পরিবেশ, আয়াসে লাভ করা জীবনের ফসল, মেঠো সুর—তাও মানুষের মনে তরঙ্গ তুলেছে। এ শুধু আজকের কথা নয়; বহুকালের দেশ এই বাংলা, সেকালেরই এই বৈশিষ্ট্য। বাংলার এক প্রান্ত তুলেছে হালকা ছন্দে বয়ে যাওয়া জীবনের ভাটিয়ালী সুর; সে টান জীবনকে নামাতেই জানে, বাঁধাবাঁধি কোন নিয়মে ঢোকাতে জানে না কারণ সেখানে আছে কষ্ট, আছে নানা প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে জীবনকে বোঝার তাগিদ। আর অন্য প্রান্ত তুলেছে মেঠোসুরের উদাস করা—আকুল করা ভাব যা জীবনকে করে বিবাগী পথচারী।

দেশের এই প্রাকৃতিক পরিবেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত জীবন ও সাহিত্যের যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে, দেখতে পাই তা আজকের রাজনৈতিক

ও অর্থ নতিক জীবনের প্রতিস্তরের জাগরণ ও দর কষাকষির দিনে মোটেই আশাপ্রদ নয়। কিন্তু এতকালের আউল বাউল, ভাবুক ও সন্ন্যাসীপ্লাবিত বাংলাদেশের নরম কোমল ভাব-শাসিত জীবনের যথার্থ রূপ ও ছবিই আমরা দেখেছি, দেশের সাহিত্যে ধৃত হোয়েছে। পলিমাটির দেশ এই বাংলা এবং তার প্রকৃতি এ-দেশের অধিবাসীদেরকে জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু মোটেই করেনি, করেছে পরকাল সম্বন্ধে ভাবতে উন্মুখ।) তাই কর্ম্মবাদ, অদৃষ্ট, দোজখ ও বেহেস্তের ভাবনায় অধীর হোয়েছে এ-দেশের লোক। মোটামুটি জীবন ছিল সহজলভ্য তাই ধর্মের দোহাই দিয়ে ইহকাল ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা হোয়েছে। সংঘাত যা এসেছে তা বিরোধী ধর্মবিশ্বাসী বিভিন্ন দলের মধ্যে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য, রুটির ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্ন নিয়ে মারামারি করার জন্য নয়। (এরই ফলে দেখা যায় বাঙালী জীবনের সাহিত্যের প্রথম ফসল তাদের চিন্তা ও ভাবনার প্রথম উৎকর্ষ ব্রহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কার বিরোধী বৌদ্ধদের দ্বারাই সম্ভব হলো।) (হিন্দু-ধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে নির্যাতিত বৌদ্ধরা বাংলার শেষ প্রান্তে এসে মাথা গুঁজেছে। তাতে তাদের ধর্ম ও সংস্কার তথা জীবন সংকটাপন্ন। এমন অবস্থায় সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের এ দেশের চিরাচরিত করনীয় প্রথানুযায়ী তারা যে আকুতি ও ফরিয়াদ জানিয়েছে সেই ফরিয়াদই অস্পষ্ট আলো-আঁধারী ভাষাতে নিষ্ফল অথচ সাহিত্যের প্রথম ধারার সৃষ্টি করেছে। সে ধারা ধর্মের, আত্ম-অবিশ্বাসের অথচ আত্মার মুক্তির।

বৌদ্ধরা গিয়েছে নিঃশেষ হোয়ে এদেশ থেকে। নিরঞ্জন তাদের রক্ষা করেনি। তারপর ব্রহ্মণ্য ধর্মের শাসন ধর্মানুশাসন দৃঢ় হোতে না হোতে এদেশে এসেছে বাস্তববাদী মুসলমানেরা। তাদের আগমনে দেশের রাজ-নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তন দেখা দিল তার ফলে এদেশের জনসাধারণের আত্মবিশ্বাসহীন চিরাচরিত চলার পথ আরও সুগম আরও মসৃণ হোয়ে গেল। তারা নির্ভর করলো বিধির বিধানের উপরে।

সেই পরনির্ভরতা ও পরমুখাপেক্ষিতা একই ধর্মবিশ্বাসের দুই বিশিষ্ট ও বিভিন্ন ধারায় আপনাকে প্রকাশ করলো। (এদেশের সমাজ-জীবনের ভিত বহিরাগত যে প্রচণ্ড শক্তির আঘাতে কেঁপে উঠলো সেই শক্তিকেই মুক্তির একান্ত পথ ভেবে নিয়ে তারই কাছে সেকালের বাঙালীরা আপনার যথা-সর্বস্ব সমর্পন করে দিয়ে সান্ত্বনা পাবার জন্য শক্তির দেবতার রূপ কল্পনা কোরে অন্তর্জীবনে তারই আসন করলো সুদৃঢ়। সেই শক্তি-দেবতার সেবায় সেদিনের বাঙালীরা যে ভাবে আত্মনিয়োগ কোরেছিল এবং বিষয়-বুদ্ধি ও বিবেকহীন লৌকিক শক্তির দেবতাদের হাতে তারা যে ভাবের নির্যাতন ও নিপীড়ন নির্বিবাদে হজম কোরেছিল মানুষের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত মেলা ভার। বাঙলার মঙ্গলকাব্যগুলোই এই উক্তির সত্যাসত্য প্রমাণ করবে। কিন্তু বহিরাগত শক্তির নিকট পরাজয়ের গ্লানি ঢাকবার জন্য তারা অন্তর্জীবনের যে কর্ষণ চালিয়েছিল তার সোনার ফসল ফলেছিল বৈষ্ণব কাব্যশাখায়। বাহিরের ঘনঘটা, বিষয় বভবের আড়ম্বর, ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন, সেই জীবনে সাম্রাজ্যশাসনের বা ক্ষমতালাভের প্রীতি—সংসারের এই বিষয়বুদ্ধিনিরত মনই তাদেরকে প্রেরণা দিয়েছিল অনন্তকাল প্রবাহের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। তাই তাদের সেদিনের ব্যবহারিক জীবনের এতবড় পরাজয়েও কুণ্ঠা বোধ করেনি বরং সেই পরাজয়ের ছুতোই তাদের অজ্ঞাতে বড় হোয়ে উঠে, অনন্ত শক্তির সঙ্গে তাদের দেহ ও মনের লীলাবিলাসের পথকে আরও সুপ্রশস্ত কোরে দিয়েছে। তাই তাদের সাহিত্যে দেখি আধ্যাত্ম অনুভূতির, আত্মরতির, প্রেমপ্রীতির ও মানা-ভিমানের এত কোমল মধুর প্রাধান্য, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে এত নিরাশার ভাব এবং পরলোক ও পরকালের চিন্তাভাবনায় এমন অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ।)

দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে এ পর্যন্ত তার আত্মবিকাশের যে ধারা আমরা লক্ষ্য করি তা দেশের নাড়ির স্পন্দনের সঙ্গে যোগ রেখেই এগিয়ে এসেছে। ব্যবহারিক জীবনের প্রতি এত ঔদাসীন্য, এমন নিস্পৃহ, অনাসক্ত

ও তন্দ্রাকাতর ভাব জাতি হিসাবে বাঙালীকে মেরে ফেলে এবং তার মেরুদণ্ডও যায় ভেঙে। এই ভাঙা মেরুদণ্ডের সুযোগ নিয়ে এ দেশে আসে ইংরেজ বেনেরা—যুগে যুগে যেমন সাংসারিক বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন বলিষ্ঠ জাতিগুলো এসেছে এদেশের বুকে জোরের দাবী প্রতিপন্ন কোরে শাসন কোরতে এ দেশকে। সমগ্র দেশ যখন ইংরেজ-রাহুগ্রস্ত তখন এ দেশবাসীর অন্ততঃ এক সম্প্রদায়েরও তন্দ্রাঘোর অনেকটা কেটে ওঠে, কিন্তু উপায় নাই তাদের সে রাহুমুক্ত হবার। ততদিনে ইংরেজ শাসনের ভেতর দিয়ে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রবল ভাবে এদেশে আসতে আরম্ভ কোরেছে, তাদের সাহিত্য ইতিহাস ও জীবনের প্রবল দাপটে বাঙালী তখন দিশাহারা। দেশব্যাপী সেই আলোড়নের দিনে, ইংরেজের দৃপ্ত জীবন ও যৌবনের সেই প্রকাশের দিনে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদেশী জীবনের যে দুর্বার শক্তি বাঙলাদেশের এতকালের সুপ্তিকে নাড়া দিয়ে গেল সেই মোহমুক্তির তথা জীবনের সার্থক কবি হলেন মাইকেল মধুসূদন। তাঁরই কাব্যে ব্যক্তি মানুষের শক্তির প্রচণ্ড স্ফুরণ দেখা গেল। ধর্ম ও গতানুগতিকতায় বিদ্রোহী ও আত্মবিশ্বাসে বলিষ্ঠ মধুসূদন জীবন ও সাহিত্যে শক্তির অপূর্ব সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন, কিন্তু প্রাক্তন সংস্কারমুক্ত হোতে পারলেন না বলে, আপনার অজ্ঞাতসারে বিধি ও নিয়তিরই অপ্রত্যক্ষ জয় ঘোষণা করলেন। তবু একথা সত্য তাঁরই কাব্যে দেবদ্বিজে বিশ্বাসী দুর্বল মানুষের চেয়ে শক্তিদৃপ্ত মানুষের সাহস ও জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁরই অসার্থক অনুকারী হলেন হেম-নবী ও কায়কোবাদ। এদের কারুর কাব্যেই বলিষ্ঠ জীবনের পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠলোনা, শক্তিমান জীবনের খোলস বিশেষের আড়ম্বর ও আস্ফালন দেখা গেল প্রচুর।

দেশ কিন্তু তার জীবন ও সাহিত্যে এ আকস্মিক পরিবর্তনের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলনা। পশ্চিমের জীবনের আঘাতে সুপ্তোত্থিত বাঙালী হঠাৎ মাথা নাড়া দিয়ে আবার চিরকালের সেই বাঁধাধরা সুপ্তির দিকে

ডুব দিতে গেল।) কিন্তু এর ভেতর দিয়ে জীবনের যে স্বাদ তারা গ্রহণ করলো তার ফলে এত কালের ধর্মবিশ্বাস পরকালমুখী। দৃষ্টির ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হলো তার নগণ্য গৃহ, প্রেমময়ী নারী, আর তার নিজের সুখ-দুঃখের সংবাদ, ভক্তি শাসিত আশা, ও আনন্দের সুখদুঃখের গান,—আত্মবিশ্বাসের না হোলেও বিশ্বাসের ও আত্মনির্ভর-শীলতার অবশ্য নয় তা সত্য; কিন্তু প্রকাশভঙ্গীমায় ও প্রকাশকের নিতান্ত অন্তর্মুখীতায় তা অত্যন্ত শ্রুতিসুখকর ও মধুর! বিহারীলালে এই ভাবালুতার আরম্ভ ও রবীন্দ্রনাথে তার চরম পরিণতি। (রবীন্দ্রকাব্যে জীবন ও জগতের প্রতি গভীর অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রকাশ ও বিশ্বাত্মীয়তাবোধের যে একান্ত আরতি দেখা যায় বাঙলা সাহিত্যে তা তুলনাহীন, তবু বৈদান্তিক ভাবসাধনার ও বৈষ্ণবীয় অনুভূতির চূড়ান্ত প্রকাশ রবীন্দ্রনাথেই হোয়েছে একথা নিঃসন্দেহ। মর্তজীবনের সকল সম্বন্ধ, সকল পরিবেশের বন্ধনজাল ছিন্ন কোরে ভাবের তুরীয় লোকে অনন্ত সত্তার সঙ্গে লীলা বিলাসে ও আত্মতৃপ্তিতে যে সুখ রবীন্দ্রনাথ তারই উপাসক। সে সূক্ষ্ম অনুভূতির চর্চায় মানুষ এমন রহস্য-রসিক, সুফী ভাবাপন্ন ও নিষ্প্রাণ হোয়ে ওঠে যে জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, সেখানে বাঁচবার কোন অধিকারই তার থাকে না। সেখানে তৃপ্তির ও আনন্দানুভূতির চরমক্ষণে মৃত্যুই হয় মানুষের চরমকাম্য, সেই মিলনই তার চরম নির্বান ও পরম মুক্তির একমাত্র সোপান।)

(অবশ্য রবীন্দ্র-প্রতিভা হচ্ছে বহুমুখী এবং বহু দেশ ও বহু জাতির জীবনাদর্শ তাঁর প্রতিভায় এসে মিশেছে। তাই দেখা যায় তিনি শেষ পর্যন্ত একান্ত আত্মানুগ সৌন্দর্য সাধনা থেকে নিজেকে অনেকটা মুক্ত যে না করতে পেরেছেন তা নয় এবং দেশের সাধারণ জীবনের অতি নিকটে এসে উন্মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়েছেনও কিন্তু দেশের শিক্ষিত সাধারণেরা দেশের অলস আবহাওয়ায় ও রবীন্দ্রকাব্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরস ও স্নিগ্ধ মনোহর সৌন্দর্যচর্চার নেশায় মেরুদণ্ড-হীন হোয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক চেতনার ফলে

তবু বাঙালীর মধ্যে কিছুটা প্রাণ-চাঞ্চল্য ও স্বদেশী আন্দোলনের সফলতা দেখা গেছে ; নইলে এ জাতির স্থান যে কোথায় হোতো তা সহজেই অনুমান করা যায়, পরিষ্কার বলতে হয় না। (পৃথিবীব্যাপী তখন প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাত, সেই যুদ্ধে সভ্যতার ভিত্তিমূল পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে, জীবনযুদ্ধে যারা মোটেই শঙ্কিত নয় তারাও জীবন-মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত ও শিহরিত হচ্ছে, তারই প্রচণ্ড আলোড়ন এ মৃত বাঙালী জাতিকেও ভীত ও সন্ত্রস্ত কোরে তুলেছে। সেই দিনে অর্দ্ধবৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথই অবশ্য তাঁর বাণপ্রস্থের আবাসভূমির মায়া কাটিয়ে চির অথর্ব এ বাঙালী-জাতির তরুণদের আহ্বান করলেন,)

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা

ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,

আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

*   *   *

শিকল দেবীর ঐ যে পূজাবেদী

চিরকাল কি রইবে খাড়া,

পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি'।

ঝড়ের মাতন বিজয় কেতন নেড়ে

অট্টহাস্যে আকাশ খানা ফেড়ে,

ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে

ভুলগুলো সব আনরে বাছা-বাছা।

আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা ॥

(রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বানে আবেগ আছে প্রচুর, বাঙালীর চিরকালের দুর্বলতা ও সংস্কার-প্রীতির 'শিকল দেবীর ঐ যে পূজবেদী' ভাঙবার দুঃসাহসিকতাও আছে যথেষ্ট কিন্তু তাঁর এ বাণীর মধ্যে বিদ্রোহ করার প্রবৃত্তি রইলেও সোহাগের ও স্নেহের টানে তা অনেকখানি দুর্বল হোয়ে

পড়েছে। জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান এ নয়।)

(তবু সেই দিন বাঙালীদের যারা 'ঘরছাড়া লক্ষ্মী ছাড়া' হোয়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ কোরে বেরুতে পেরেছিল তারা দেখেছিল তাদের পত্নীচালিত, মাতৃলালিত, অঞ্চল-আশ্রিত এবং ধুতিচাদরপরিহিত বাতাসে হেলেদুলে চলা জীবনের সঙ্গে যথার্থ বলিষ্ঠ জীবনের পার্থক্য কোথায়। এ তন্দ্রাকাতর ভাবশাসিত জীবনের সৌন্দর্য আছে তা শুধু কর্মময় জীবন-বিচ্ছিন্ন শিল্প-চর্চায়, কিংবা শ্বশুর বাড়ীতে, নইলে বালিগঞ্জের কিংবা অনুরূপ কোন লেকের পাড়ে কিংবা নদীর ধারে; কিন্তু জীবনের অস্তিত্বেরই যেখানে কোন স্থিরতা নাই, অনবরত যেখানে বোমা ফাটছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঘন ঘন অশনিপাত হচ্ছে, এরোপ্লেনের শোঁ শোঁ ও ঘর্ঘর ধ্বনি, কামানের গর্জন, এয়ার ক্র্যাকটের কর্ণ-বিদারক আওয়াজ, লোহায় লোহায় ঘর্ষণ, তরবারির ঝন্ ঝন্, ভূমিকম্পের গুম্ গুম্ শব্দ, মেঘের ডমরুধ্বনি, সাইরেনের ক্যাঁক্যাঁ, বসুধার মৃত্যুযন্ত্রনার কাতরানি, মানুষের পৈশাচিক মৃত্যু, তার আকুল আর্তনাদ যেখানে বাঁচবার কোন উপায় অবলম্বনই নাই—প্রাসাদের আরাম বিলাসের উপকরণ, মমতাময় নারীর স্নেহের কোন কথা যেখানে মনে পড়েনা—মাটি শুকনো, ভেজা, বারুদের গন্ধভরা কালো মাটি যা একেবারে নিরাভরণ অথচ মানুষের সবচেয়ে প্রিয় আশ্রয়, যে মাটিকে আঁকড়ে ধরে প্রাণের মমতায় কামড়ে পড়ে থাকবার অন্তিম পিপাসা জাগে, যে মাটিকে বুকের আলিঙ্গনে বেঁধে নীচে—আরও নীচে চলে' যেতে ইচ্ছে করে—সে শুধু প্রাণে বাঁচবার জন্য, পৃথিবীর শেষ নিঃশ্বাসটুকু নেবার জন্য—জীবনের এই যে বিভীষিকার ছবি এরও এক ভয়াবহ বীভৎস সৌন্দর্য আছে। সে সৌন্দর্যকে মুখোমুখী সাক্ষাৎ করতে হয়, প্রাণের পেয়ালা উজাড় কোরে দিয়ে মৃত্যুর মধ্যে বাস কোরেই মৃত্যুঞ্জয় হোতে হয়। তবেই আসে শক্তি সাহস আত্মপ্রত্যয়, বিদ্রোহের ভাব এবং মানুষের জীবনে অসম্ভব সম্ভাবনার ইংগিত।

(মহাযুদ্ধের এই ভয়াবহ জীবন সৌন্দর্যের পূজারী কবি হলেন হাবিলদার কাজি নজরুল-ইসলাম।) নজরুলের সঙ্গে বাঙালীর এর পূর্বে কোন পরিচয় হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রের কোন্ বিরাট প্রাঙ্গনে কবি একান্ত গোপনে তাঁর সাধনায় সফলতা লাভ করেছেন তা বাঙালী জানবারও অবসর পায়নি। হঠাৎ এক-দিন শোনা গেল গতানুগতিক বীণার সুর ছেড়ে কে এক বাঙালী কবি ড্রামের ধ্বনি-নির্ঘোষে বাঙালীদের আহ্বান করছেন,

ওরে আয়!
ঐ মহাসিন্ধুর পার হোতে ঘন রনভেরী
শোনা যায়—
ওরে আয়!
ঐ ইসলাম ডুবে যায়
যত শয়তান
সারা ময়দান
জুড়ি' খুন তার নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে
জয়গান শোন গায়।

*　*　*

ওরে আয়।
ঐ ঝন ঝন ঝন রণ ঝন ঝন ঝঞ্ঝনা
শোনা যায়!

কিংবা

ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে
কামাল ভাই,
অসুরপুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল
সামাল ভাই!
কামাল তুনে! কামাল কিয়া ভাই!

হো হো কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই !

* * *

দ্রাম্ ! দ্রাম্ ! দ্রাম !

লেফট ! রাইট ! লেফট !

লেফট ! রাইট ! লেফট !

দ্রাম্ ! দ্রাম্ ! দ্রাম !

এ যেন যুদ্ধক্ষেত্রোত্থিত যুদ্ধেরই ধ্বনি। এতে ভীত হোলেও জীবন ও যৌবনের কাছে এর আবেদন কখনই অগ্রাহ্য হয় না। তাই বাঙালী সেদিন জাতিধর্মনির্বিশেষে মুসলমান কবি নজরুলকে অকুণ্ঠচিত্তে বরণ কোরে নিয়েছে। এবং একদিনেই তিনি আবাল-বৃদ্ধ বণিতার কবি হোয়ে উঠেছেন।

(মনে রাখতে হবে মুসলমান ঘরে নজরুলের জন্ম। মুসলমানের জীবনাদর্শ কোমলে কোমল কিন্তু ভীষণতায় ভয়ঙ্কর।) (নীতির সৌন্দর্য এবং ব্যবহারিক জীবনের সহজ স্বাভাবিকত্বই এককালে বিদ্যুৎগতিতে পৃথিবীময় ইসলামের জয়যাত্রা ঘোষিত কোরেছিল কিন্তু তারও সঙ্গে মিশেছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার দুর্বার সংগ্রামের সাধনা, পৃথিবীর প্রচলিত ও জড়ত্বপ্রাপ্ত নীতির বিরুদ্ধে বিপ্লবের স্পৃহা। মুসলমান জীবনের এই শিক্ষা ও সৈনিকের আদর্শ মনোবৃত্তি ভাবপ্লাবিত ভারতভূমিতে পড়ে কিছুকালের মধ্যেই ভাবালুতায় ভরে' ওঠে। (ইসলামিক ও ভারতীয় এই দুই সংস্কৃতির সংঘাত উত্তর পশ্চিম ভারতেই সংঘটিত হয়েছিল।) সেখান থেকেই মুসলমানের কৃষ্টি সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হোয়েছিল। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশও মানুষকে অনেকটা কঠিন কোরে তোলে, তাই দেখা যায় আজ পর্যন্ত সেখানে ইসলামের বলিষ্ঠ জীবনসাধনা ভারতীয় ভাবধারার আফিংএর নেশার ঘোর কাটিয়ে অনেকটা অক্ষুণ্ণ থাকতে পেরেছে এবং ইকবালের মত ইসলামের কবির জন্ম সেখানেই সম্ভব হোয়েছে কিন্তু রাজধানী দিল্লী তথা

ইসলামের আদর্শ ও সংস্কৃতি-সাধনার প্রচার ক্ষেত্র উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে বাঙলাদেশ বরাবরই একরকম বিচ্ছিন্ন রয়ে গেছিল। এদেশে ইসলাম যা প্রচারিত হোয়েছে তা অনেকটা অধ্যাত্মবাদী আউলিয়া বা সাধকদের দ্বারা। পলিমাটির এই বাঙলাদেশের মুসলমানদের জীবন গোড়া থেকেই এদেশীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় প্লাবিত হোয়েছে। তাদের জীবনের আদর্শ বিপ্লব সাধনার ভেতর দিয়ে তেমনভাবে অগ্রসর হয়নি। তবু জাতি-স্মর কবি নজরুলকে অবলম্বন কোরে ইসলামের উদগ্র জীবন-সাধনা যেমন একদিকে এতকালের ঘনীভূত জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলে মাথা নাড়া দিয়ে উঠবার প্রয়াস পেয়েছে তেমনি বাঙলার আদিম তন্দ্রাঘোরও অনেকটা কেটে উঠেছে।)

দরিদ্র ঘরে নজরুলের জন্ম। দারিদ্র্যের কঠোরতা মায়ামমতাশূন্য বন্ধনহীন জীবন, যুদ্ধের হিংস্র ও পৈশাচিক পরিবেশ, সেখানে টিকে থাকার একান্ত প্রয়াস এবং সর্বোপরি ইসলামের বলিষ্ঠ জীবনবোধ নজরুলকে জীবন সম্বন্ধে এক অভিনব প্রকাশভঙ্গী দান কোরেছে, কোরে তুলেছে আত্মশক্তির উপাসক এবং জুগিয়েছে এদেশের চিরাচরিত নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্তভাব ও অদৃষ্ট ও কর্মবাদের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করার তীব্র প্রবৃত্তি। তাই তিনি এত কালের বিধিনিষেধের শিকল ভেঙে সুপ্তি থেকে দেশকে মুক্তি দিবার জন্য চারণ কবির মত গান গেয়ে বেড়িয়েছেন,

আমি—জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি
সৃষ্টির ঐ চাতুরী,
তাই বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে,
ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি।
আমি—জানি জানি ঐ ভুয়ো ঈশ্বর
দিয়ে যা হয়নি হবে তাও,
তাই—বিপ্লব আনি বিদ্রোহ করি,

নেচে নেচে দিই গোঁফে তাও।

কিংবা,

মম ধূর্জটি শিখা করাল পুচ্ছে

দশঅবতারে বেঁধে ঝ্যাটা করে,

ঘুরাই উচ্চে, ঘুরাই—

আমি অগ্নি কেতন উড়াই!

কিংবা,

শক্রর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর

সাথে পঞ্জা

আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা,

* * *

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়

আমি অজর অমর অক্ষয় আমি অব্যয়!

আমি মানব দানব দেবতার ভয়,

বিশ্বের আমি চির দুর্জয়,

জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,

আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি

এ স্বর্গপাতাল মর্ত্য!

এই দৃষ্টিভঙ্গী এবং দুর্বার প্রাণ-শক্তিই নজরুলকে ভবঘুরে কোরেছে এবং শেষ পর্যন্ত এই শক্তিই তাঁকে কোরে তুলেছে বিদ্রোহী। বাঙলাদেশের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী, তার বিধি ও বিধানপ্রীতি এবং সর্বোপরি আত্মশক্তির প্রতি যে অবিশ্বাস বাঙালীকে তিলে তিলে নির্জীব কোরে তুলেছে যার ফলে বাঙালী দৈন্য ও দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস কোরেও, এমনকি প্রবল অত্যাচারী ও জমিদার শ্রেণী কর্তৃক শাসিত ও শোষিত হোয়েও আপন অদৃষ্টকে ধিক্কারও দিতে শেখেনি বরং সেই দৈন্যকেই আপন অদৃষ্টের একান্ত

নিদান বলে মেনে নিয়েছে, এই মৃতপ্রায় প্রাণ-স্পন্দনহীন জাতিকে তার সুষুপ্তি থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি আত্মবিশ্বাসের ও বিদ্রোহের জয়-গান কোরলেন, তাকে ভাবতে শেখালেন—মানুষ ছোট নয়, মানুষের আত্মা শুধু ভয়েই সঙ্কুচিত হোয়ে ওঠে, ভয়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে পারলে সে দেখবে দারিদ্র্য তাকে ভিখারী করে না, মানুষের চোখে তাকে হেয় ও হীন করে না—দেয় 'উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি' আর 'অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস।') বাঙালীর প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য তাই তিনি বলতে বাধ্য হোলেন,

বল বীর,
চির উন্নত মমশির!
শির নেহারি আমারি, নত শির
ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর,
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি,
চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে
রাজ রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর
আমি চির উন্নত শির!

* * *

(মানুষ আত্মশক্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠ হোলে দেখতে পায় সে কত বড়, বিধির কাছে তাকে যেতে হয় না বরং বিধিই তার কাছে এসে ধরা দেয়; সে

ছোঁতে পারে হিমালয়ের মত যার ললাট চুম্বন কোরতে আকাশ নেমে আসে অথচ তাকে আকাশের দিকে অধীর উৎকণ্ঠা নিয়ে চেয়ে থাকতে হয় না; যার সত্য আমরা ইকবালের কাব্যেও দেখতে পাই

আয় হিমলা' আয় ফাসিলে কেশ্‌ওরে
হিন্দুস্তাঁ।
চুমতাহায়, তেরি পেশানিকো ঝুঁক
কার আসমাঁ।'

এই সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালীর জন্য বীররসের নিশান চড়িয়ে নজরুল বললেন,

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে
মোর চোখ হাসে মোর মুখ হাসে
আর টগবগিয়ে খুন হাসে
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে

জীবনের সাধনাই হলো যৌবনের সাধনা। জীবনের তেজ, তার দুর্জয় সাহস, অকুণ্ঠিত মনোভাব, সাহসবিস্তৃত বক্ষপট, রক্তের সজীবতা, প্রাণের চাঞ্চল্য, জীবন-যুদ্ধে দ্বিধাহীনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ্রহ যৌবনেই সম্ভব। যৌবনই জীবনের মধ্যমণি। সেই যৌবনে জীবনের সমস্ত বাঁধন আলগা কোরে দিয়ে জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করার মধ্যে যে ভীষণ মাদকতা আছে বাঙালীর কাছে তা একেবারেই অজ্ঞাত।) নজরুল এই দিক দিয়ে তার পূর্বসারী, তাঁর অগ্রজ, ইসলামের প্রাণ-সাধনার কবি ইকবালের ভাব-শিষ্য। দৃপ্ত যৌবনের গুণগান কোরতে গিয়ে ইকবাল বলেন—যৌবনের ইতিহাস এক উন্মাদকর, বৈচিত্র্যময় দুঃসাহসিকতার ইতিহাস, প্রতিরাত্রে নূতন স্বপ্ন দেখার, নূতন রং রেখার সৃষ্টির ইতিহাস, রক্তের উগ্রসাধনার ইতিহাস—কারণ তিনি জানেন,

'তায় শাবাব আপনে লহুকি আগমে

জ্বালনেকা নাম।
শাখ্‌তে কোশিসে হায় তাল্‌খে
যেন্দেগানী আন্‌গ্‌বি

'আপন রক্তের আগুনে জ্বলার নামই হলো যৌবন, জীবনের কষ্ট এই যৌবনের সাধনায় অপূর্ব মধুরতায় ভরে' ওঠে।'

এও সত্যি, কোন জাতীয় জীবনে যৌবনের আগুন যদি এমনিভাবে জ্বলে ওঠে তা হোলে পৃথিবীর বুকে এমন জাতি নাই যে তাকে দাবিয়ে রেখে শোষণ কোরতে পারে। নজরুল এই সত্য ভালো কোরে বুঝেছিলেন। তাই তাঁর 'টগবগিয়ে খুন হাসার' সংবাদ আপন দেশে এমনভাবে প্রচার কোরে আশার ও আশ্বাসের বাণী ছড়িয়েছিলেন,

তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল বৈশেখীর ঝড়
তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

সেদিনের বাঙালীরা নজরুলের এই দ্বিধাহীন প্রাণচাঞ্চল্য ও দুর্বার শক্তি-সাধনাকে এত সশ্রদ্ধ চোখে দেখেছিল যে খেলাফত আন্দোলনের কবি হিসাবে তাঁকে বরণ কোরে নিতে তাদের সঙ্কোচ হয়নি। আর বাঙলার সন্ত্রাসবাদীর দলও এই কবিকেই দিয়েছিল তাদের জয়মাল্য। রাজনৈতিক অসহযোগ আন্দোলনে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তার জন্য অনেক নির্যাতন ও কারাভোগ পর্যন্ত তাঁকে সহ্য করতে হয়। তিনি তা ভ্রূক্ষেপ করেননি। তাই দেখি বাঙলার বুকে যে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল এবং অসহযোগ আন্দোলনেও যা সার্থক ভাবে জ্বলে উঠলোনা বাঙলার যৌবনে সেই অভিমান বাঙালী কবি নজরুলের লেখনীতে রূপায়িত হচ্ছে,

আমি দুর্বার
আমি ভেঙে করি সব চুরমার,
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল
আমি দলে যাই যত বন্ধন,
যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।

জীবন সম্বন্ধে তাঁর এই চেতনার সমগ্র স্ফুরণ হোতে না হোতেই বাঙালি একদিন দেখতে পেলো কবির হাতের তলোয়ার কোন আঘাতে একেবারে শ্যামের বাঁশরীতে পরিণত হোয়ে গেছে। তা আর মাথা ভাঙছেনা, গলাও কাটছেনা, মধুর সুন্দর সুর তুলেছে,

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে
দিসনে আজি দোল
আজো তোর ফুলকলিদের ঘুম টোটেনি
তন্দ্রাতে বিলোল।'

সঙ্গীতের এই মধুর সুর ঝঙ্কার আমাদের দুঃখিত কোরেছে যতটুকু তারও চেয়ে বেশী কোরেছে মুগ্ধ। কারণ উন্মাদনা হয়ত এতে ছিলনা সত্যি, কিন্তু এ সুর নূতন ছন্দে ও ভাবমাধুর্যে বাঙালীকে এমনভাবে মুগ্ধ করলো যে চিরকালের ক্রন্দন প্রিয় বাঙালী অবশেষে এরও কাছে আত্মসমর্পন করলো। নজরুলের আকস্মিক এই পরিবর্তনে দুঃখ করার আমাদের অনেক কিছু আছে কিন্তু বিস্মিত হবার তেমন কিছু নেই। (কারণ পূর্বেই বলেছি এদেশের প্রকৃতিতে করুণ রসেরই প্রাধান্য। এদেশের হাড়ে মাংসে, অস্থি মজ্জায় কারুণ্যের এবং কান্নার ছড়াছড়ি, কোমল মৃদুল আবহাওয়ারই বাড়; বীররস এদেশের ভেজা মাটিতে বিশেষ ফলেনি। তাই দেখি মধুসূদনও গলে' গেলেন, অনুকারী হেম-নবীন ও কায়কোবাদ হোলেন নাস্তানাবুদ আর রবীন্দ্রনাথ এদেশের ধাত বুঝে ওপথে পা বাড়ালেন না।) নজরুলের সত্যকার যা সৃষ্টি এবং যা তাঁর ভাবদৃষ্টিতে গভীরতা লাভ কোরেছে তা

তাঁর এই শ্যামাসঙ্গীত, বৈষ্ণব গান ও গজল গানে। এই বিশেষ বিশেষ সঙ্গীতের সাহায্যেই তিনি দেশের ধুলো মাটির অন্তরে প্রবেশ পথ পেয়েছেন। তবে একথা সত্য যে এখানে তিনি একলা নন, এখানে তাঁর বৈশিষ্টও হয়ত থাকবে চিরদিন কিন্তু নজরুল যেখানে বাঙলা সাহিত্যে অমর এবং যেখানে তাঁর জুড়ি কোন কালে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ তা তাঁর দুর্বার আমির সাধনা, অভ্যুগ্র আত্মবিশ্বাস ও বেদনালাঞ্ছিত মানবতার অবুছিত জয়গান করার জন্য এই বিদ্রোহের ভাব যা হয়ত সৃষ্টি হিসেবে খুব বড় নয়, হয়ত তার অনেকখানিই উচ্ছ্বাস, অনেকটাই ধ্বনি ও শব্দের ব্যঞ্জনাতে ভর্তি তবু একথা অবিসংবাদিত সত্য যে নজরুল চিন্তালেশহীন ভাস্বর ললাট দুর্মদ চির তারুণ্যের কবি, যৌবনের কবি এবং যুদ্ধের কবি।) নজরুল-প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য সেকালের বাঙালীকে যেমন বিস্মিত ও মুগ্ধ কোরেছে, চিরকালের তরুণ-তরুণী ও যুব-সমাজকে প্রাণের অপরিসীম শক্তির আবেদনের জন্য তেমনি ভাবেই মুগ্ধ কোরবে। নজরুল প্রতিভা তাই একটা বিস্ময়, ধূমকেতুর মতই তার আবির্ভাব ; চকিত ঝলকে সে প্রতিভা হঠাৎ তার পক্ষপুট বিস্তার কোরে বাঙলার আকাশের দিগদেশ উদ্ভাসিত কোরে পরক্ষণেই অন্তর্হিত হোয়ে গেল। তাঁর প্রতিভার এই যে বিদ্যুদ্দীপ্তি 'extra fire' এর সঙ্গে বাঙালী কবি মাইকেল মধুসূদনের প্রতিভার তুলনা হয়। উভয় কবিই তাঁদের কাব্যের উৎকর্ষের দিনে ঝড়ের বেগে চলেছিলেন। তাই দেখা যায় উভয়েই সেই ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যে আত্মধ্বংসকারী প্রতিভার সেবা করতে গিয়ে ধ্বংস ও সৃষ্টির মাঝখানে বসে যা কিছু দেওয়ার তা এক নিশ্বাসে দান কোরে দিয়ে উধাও হোয়ে গেছেন।

(বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জীবন নিয়ে এই টানা হেচড়ার দিনে জীবন সম্বন্ধে নির্জীব মৃত বাঙালীরও যখন দৃষ্টিভঙ্গী বদলাচ্ছে এবং তার সাহিত্যও যেখানে গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে স্বতন্ত্র আলোর পথের

সন্ধানে ছুটে চলেছে তখন প্রশ্ন জাগে এ পথে শেষ পর্যন্ত কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী জয়ী হবে? এতে নজরুলের প্রদর্শিত পথ কোনো সহায়তা কোরবে কি? তাঁর প্রতিভার যে বৈশিষ্ট্য বাঙালীকে হয় ত বাঁচিয়েই দিয়ে গেল সে প্রতিভা কি বাঙালীর কাব্যে কোন স্থায়ী আঁচড়ই কাটবে না। কবি বেঁচে আছেন। আমাদের বড় দুর্ভাগ্য তিনি জীবিত থেকেও বাঙলার বিক্ষুব্ধ পরিবেশে কোন সহায়তা কোরতে পারবেন না। যে 'আগ্নেয়াদ্রি'—বাড়ব-বহ্নিকালানল-কবি তাঁর অগ্নিগর্ভ থেকে এত লাভানিঃসরণ কোরে এককালে বাঙলার আকাশ অত্যুজ্জ্বল কোরে তুলেছিলেন—দুঃখ হয়, তিনি কি তাঁর এই যোগ-প্রভাব মুক্ত হবেন না? তাঁর ঘুম কি আর ভাঙবেনা?

মিল্লাত,
ঈদ সংখ্যা, ১৩৫৩।

বাঙলা কাব্যের নতুন ধারা ও নজরুল

সাহিত্য বস্তু ও আদর্শবাদ সম্বন্ধে একটা তর্ক চলে আসছে। এ তর্ক আজকের নয়, বহুদিনের। অত্যাধুনিক কবি সাহিত্যিকদের অনেকে বস্তুবাদের নামে বস্তুর প্রান ছেড়ে খোলস নিয়ে টানা হেঁচড়া ক'রে থাকেন। তাঁদের বোঝা উচিত যে সাহিত্য বস্তুর হুবহু প্রতিলিপি নয়, ক্যামেরায় তোলা ফটোগ্রাফও নয়। আদর্শবাদের কথা বাদ দিলেও অতিবড় বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যও শিল্পীমনের পরিচয় থাকে। হৃদয়ের জারক রসে বাড়িয়ে সাহিত্যিক তার অনুভূতি লব্ধ সত্য ও সত্তার প্রকাশ করেন।

সুতরাং সাহিত্য জীবন নয়, জীবনও সাহিত্য নয়। সাহিত্য ও জীবন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে অন্বয় কিংবা বিরোধকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যের সৌধ নির্মান করা হয়। যে কবি কিংবা সাহিত্যিক জীবন ও সাহিত্যের ব্যবধান ঘুচিয়ে, তাদের মধ্যে নিকটতম সেতু যোজনা করতে পারেন, মনে হয়, তিনিই আদর্শ বস্তুবাদী সাহিত্যিক। সুতরাং যুগ ও জাতির প্রানস্পন্দনকে বাদ দিয়ে যে সাহিত্য, সমালোচনার আদর্শ মাপকাঠিতে সে সাহিত্য যত বড়ই হোকনা কেন, সে সাহিত্যকে নিয়ে মানুষের মনে দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে।

সর্বহর কালের নির্মম কবলে, নজরুল সাহিত্য কালজয়ী হবে কিনা সে প্রশ্নের মীমাংসা কালই করবে। আমাদের দিক থেকে তার বিধান দেওয়ার ধৃষ্টতা না থাকাই ভালো।

তবু এ কথা অবিসংবাদিত সত্য যে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও চতুর্থ দশকের মধ্যে পাক ভারত উপমহাদেশের বুকের উপর দিয়ে যেসব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা জটিল আকারে দেখা দেয়, তাতে অগণিত

মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বাঙলাদেশই সমূহ সমস্যার বিষে বিশেষভাবে জর্জরিত হয়।)

(শতাব্দীর প্রথম দশকে বঙ্গভঙ্গ, দ্বিতীয় দশকের সুরুতে বঙ্গভঙ্গ রদ ও শেষে খেলাফত আন্দোলন এবং এরই সমসাময়িক যুগে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, এবং দেশের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য যুবশক্তির সন্ত্রাসবাদ। এসব বহুবিধ সমস্যা ও আন্দোলনে বাঙলা দেশ তুমুল ভাবে আলোড়িত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নজরুলের শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়। তাঁর কবি মানস দেশের এই অশান্ত পরিবেশে বর্দ্ধিত এবং পুষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাঁর স্পর্শকাতর প্রাণে এ অভিনব সমস্যাগুলি আলোড়ন তোলে। যুগ ও জাতির এ সমস্যার গুরুত্ব যে কত গভীর এবং সুদূর প্রসারী, তা চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন। জাতীয় জীবনের এহেন পটভূমিতে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া প্রভৃতি দেশে মহাবিপ্লব সাধিত হয়ে গেছে। জাতীয় জীবনের দুর্দিনে কাণ্ডারী সেজেছেন, সে সব দেশের কবি সাহিত্যিকেরা।)

বিদেশী রাজশক্তি কিংবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট দেশী প্রতিক্রিয়াপন্থীদের কোন নিষ্পেষনই কোনদিনই জাগ্রত জাতি ও মানুষের কণ্ঠকে রোধ করতে পারেনি। ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মে বিলম্বে হলেও গন-শক্তিরই জয় হয়েছে অবধারিত। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পট-ভূমিতে যুগ ও জাতীয় মনের সংগে নজরুল যেভাবে নিজকে জড়িত করে-ছিলেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। দেশের নাড়ী নক্ষত্রের সঙ্গে কবির আত্মিক যোগ স্থাপিত না হলে কোন কবির পক্ষে দেশের সমস্যাবলীকে কাব্যের রসায়নে সিক্ত করে সত্যকার কাব্য সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়না।

এদিক থেকে বিচার করলেই স্বীকার করতে হয় যে নজরুল সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যে একটি নতুন যুগের সূত্রপাত করেছে এবং নতুন আশার সন্ধান দিয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে বাঙলা দেশে মার্কসীয় চিন্তাধারাকে অনুসরন করে সাহিত্য সৃষ্টি করার একটা হিড়িক পড়ে যায়। যুগের সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান সাহিত্যিকেরা দিন বা না দিন, সেই সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং তাকেই সাহিত্যের প্রান কেন্দ্র ক'রে তোলার মধ্যেই ফুটে ওঠে কবি মনের সজীবতার লক্ষণ। দেশের অধিকাংশ সমস্যাই দেশের সম্পদ বণ্টনের বৈষম্যজাত। অর্থনীতির এই সাধারণ প্রশ্নই যুগে যুগে দেশকে নানা সমস্যার সম্মুখীন করেছে। আমাদের দেশের অর্থনীতি কৃষি-নির্ভর। মাটীই এ দেশের বড় সম্পদ। সেই মাটীরই সুষ্ঠু চাষ এবং তার সুষ্ঠু বণ্টনই এদেশের অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তিক করতে পারে। নজরুল যে এ বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন তাঁর কাব্য থেকেই সে ইংগিত আমরা পাই :—

মাঝিরে তোর নাও ভাসিয়ে
মাটীর বুকে চল।
শক্ত মাটীর ঘায়ে হউক রক্ত পদতল।
প্রলয় পথিক চলবি ফিরি
দলবি পাহাড় কানন গিরি।
হাঁকছে বাদল ঘিরি ঘিরি
নাচছে সিন্ধু জল।
চলরে জলের যাত্রী এবার
মাটীর বুকে চল।

প্রাক পাকিস্তান যুগের হিন্দু মুসলিম সংগ্রাম ও সংঘর্ষে দেশের প্রান-শক্তির অপচয়ে কবি বেদনা বোধ করেছেন :—

অসহায় জাতি মরেছে ডুবিয়া জানেনা
সন্তরন
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার

মাতৃ মুক্তি পণ।
হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে
কোন জন।
কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান
মোর মার।

মানুষকে মানুষ হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। দরিদ্র অশিক্ষিত ব'লে, সমাজের নিম্নশ্রেণীতে জন্ম ব'লে, মানুষকে দূরে সরিয়ে রেখে সুবিধাবাদীরা যে সুবিধা ভোগ করছে তাদের বিরুদ্ধে নজরুলের অভিযান। এ অন্যায় অত্যাচারী সুবিধাবাদীদের আয়ু শেষ হ'য়ে এসেছে, সে বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত স্থির :—

ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা শঙ্কা
নাহিক আর!
মরিয়ার মুখে মারনের বানী
উঠিতেছে মার মার!
রক্ত যা ছিল করেছে শোষন,
নীরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ,
শতশতাব্দী ভাঙে নি যে হাড়, সেই
হাড়ে ওঠে গান
জয় নিপীড়িত জনগণ জয়!
জয় নব উত্থান!
জয় জয় ভগবান!

দুর্মদ দুর্বার যৌবনের কবি নজরুল মহা বিপ্লবে দেশের শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। দেশের যুগ যুগান্তের যুব শক্তির ও নিপীড়িত মজলুমের অভিনন্দন নজরুল চিরদিনই পাবেন। যুগের শ্রদ্ধা যিনি পেয়েছেন, দেশের ইতিহাসে তাঁর আসন স্থায়ী।

মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নজরুলের হাতেই বাঙলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম জীবন্তরূপ পায়। মুসলিম জীবনের আশা আকাঙ্খার রূপায়নেও বাঙলা সাহিত্যে তিনি কারুর অনুসারী নন বরং অভিযাত্রী কবি। সেখানেও তিনি নবযুগের প্রবর্তক।

যুগ ও জাতির সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে বাঙলা কাব্য সাহিত্যের নূতন ধারার সূত্রপাত করেছেন নজরুল। তাঁর পরবর্তী কয় বছরের বাঙলা কাব্য সাহিত্যের খতিয়ান নিলেই মনে হবে যে সেই পথ ধরেই বাঙলা কাব্য সাহিত্য এগুচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এগুবে।

মাহেনও
মে, ১৯৫৪।

কবি শাহাদাৎ হোসেন।

শাহাদাৎ হোসেন ১৩০০ সালে (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) ২৪ পরগনার বারাসাত মহকুমার পণ্ডিতপোল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। আমাদের এ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকের মুসলমান সাহিত্যিকদের মতো কলেজী শিক্ষার সৌভাগ্য তাঁরও হয়নি।

১৯১৫ সালে বশীর হাটের কবি ভুজঙ্গ ধরদের 'বাণী সম্মিলনী' নামক এক সাহিত্য চক্রের এক অধিবেশনে কবিতা পড়ে তিনি সর্বপ্রথম সাহিত্যের আসরে প্রবেশ লাভ করেন। নজরুল আসেন তাঁরও বছর পাঁচেক পরে। সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে শাহাদাৎ হোসেন নজরুলের বয়োজ্যেষ্ঠ।

শাহাদাৎ হোসেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক' কবি, নাট্যকার ও ছোট গল্প লেখক। এদিক থেকে বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে মীর মশার্রফ হোসেনেরই তাঁকে উত্তর সাধক বলা যায়। সাহিত্য সৃষ্টির আনন্দ বেদনায় অধীর মীর মশার্রফ হোসেনের মানস প্রকৃতির সঙ্গে শাহাদাৎ হোসেনেরই আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মীর সাহেবও রচনা করেছিলেন নাটক, উপন্যাস প্রহসন, রচনা ও কবিতা। তবে মীর সাহেব গদ্য লেখক হিসেবে সমধিক পরিচিত। আর শাহাদাৎ হোসেনের প্রতিভা স্ফুরিত হয়েছে তাঁর কবিতায়।

শাহাদাৎ হোসেন ছোটবড়োতে গোটা তিরিশেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির নাম :—

উপন্যাস :—১। মরুর কুসুম। ২। হিরণ রেখা। ৩। পারের পথে। ৪। স্বামীর ভুল। ৫। ঘরের লক্ষী। ৬। খেয়াতরী।

৭। সোনার কাঁকন। ৮। রিক্তা। ৯। যুগের আলো। ১০। পথের দেখা। ১১। কাঁটাফুল। ১২। শিঁরি ফরহাদ। ১৩। লায়লী মজনু। ১৪। ইউসুফ জুলায়খা।

নাটক :—১। সরফরাজ খাঁ। ২। আনার কলি। ৩। মসনদের মোহ।

কবিতা :—১। মৃদঙ্গ। ২। কল্পলেখা। ৩। রূপচ্ছন্দা। মধুচ্ছন্দা।

শিশু পাঠ্য পুস্তক :—১। মোহন ভোগ। ২। ছেলেদের গল্প। ৩। গুলবদন। ৪। জাহানারা।

এ ছাড়াও তাঁর রচিত বহু কবিতা ও কিছু গল্প মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত প্রভৃতি মাসিক পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে।

শাহাদৎ হোসেনকে বিচার করতে হবে তাঁর সৃষ্টির সাহায্যেই। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি নজরুলের বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও মুসলিম চিত্ত জাগরণে কিংবা সমসাময়িক কালের বিভিন্ন আন্দোলনে নজরুলের মতো তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি। ১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে কলকাতার মির্জাপুর পার্কে একটি বক্তৃতা করার জন্যে তাঁকে মাস তিনেক সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। তথাপি ১৯২০ সাল থেকে খেলাফত আন্দোলন, আইন অমান্য, কি অসহযোগ আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতি রাজনৈতিক মানসচাঞ্চল্য ও চিত্ত বিক্ষোভ তাঁর সাহিত্যে কোন স্থায়ী আঁচড় কাটতে পারেনি। তিনি যুগের কবি ছিলেন না। যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যতটুকু সাড়া তিনি দিয়েছেন তা নিতান্তই যুগের আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই।

মুসলিম ঐতিহ্য ও মুসলিম ভারতের ইতিহাসের কতকগুলো অংশ তাঁর কবি-প্রতিভাকে চমৎকৃত করেছে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আর পাঁচজন খাঁটি মুসলমানের মতো মনে প্রাণে তিনি উল্লসিতও হয়েছেন, নিখিল মুসলিম

জাহানে পাকিস্তান যে বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্বেরই পূর্ণবিকাশ সূচনা করেছে এ আশা ও আশ্বাসে তাঁর হৃদয়ও উদ্বেলিত হয়েছে, তবু শাহাদৎ হোসেনের মানস প্রকৃতির বহিরাবরণ হিসেবেই এগুলো বিরাজ করছে। তাঁর কবি প্রকৃতির যথার্থ বৈশিষ্ট্য এ নয়।

শাহাদৎ সংখ্যা এলানে 'আমি যখন ছাত্র ছিলাম' শীর্ষক তাঁর যে জীবন স্মৃতিটুকু বেরিয়েছে তার একজায়গায় আছে "কবিতা লেখা এবং আবৃত্তি করা তখন যেন আমার একটা ম্যানিয়া হয়ে গিয়েছিল। তখনকার যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এর অনুকূলে ছিল বোলেই বোধ হয় এটা সম্ভব হয়েছিল। মাইকেলের দুন্দুভিনাদে প্রতিধ্বনিত বাঙলার মধ্যগগণে তখন রবীন্দ্রনাথ ভাস্বর কিরণে প্রোজ্জ্বল আর তাঁর চারপাশ ঘিরে জ্যোতিষ্মান গ্রহগণের অপূর্ব সুন্দর সমাবেশ, কাজেই সে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে কাব্যের অনুপ্রেরণা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বোলেই মনে হয়।" এ কথাগুলোর মধ্যেই শাহাদাৎ হোসেনের কবি প্রকৃতির একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

শৈশব ও যৌবনে তিনি দুর্দান্ত প্রকৃতির থাকলেও যে পারিপার্শ্বিকতায় তাঁর কবি মন তৈরী হয়েছে তা অনেকটা শান্ত। বঙ্গভঙ্গ রদ্ এবং খেলাফৎ আন্দোলনের মধ্যবর্তী সময়ই তাঁর মানস গঠনের কাল। বাঙলার অপেক্ষাকৃত এ শান্ত পরিবেশে বহুকাল বিগত মাইকেল মধুসূদনের গুণগ্রাহী ভক্তরাও একে একে নিঃশেষিত হয়ে আসছে, হেমনবীনের ডমরু ধ্বনিও বাঙলার কাব্যোদ্যানে আর শোনা যায় না। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়ে জগৎ সভায় স্বীকৃতি লাভ করছেন। তখন বাঙলাদেশেও রবীন্দ্র প্রশস্তি চলেছে।

এ পারিপার্শ্বিকতায় অলক্ষ্যে শাহাদাৎ হোসেনের যে মন গড়ে উঠেছিল তা' সম্পূর্ণভাবেই 'রবিদীপ্ত'। জীবন ও জগৎকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে, তাতে মায়াঞ্জন লাগিয়ে। সংসারের সাধারণ

মানুষের ব্যথা দ্বন্দ্ব, ঘাত প্রতিঘাত, সুখ দুঃখ সংসারের আর পাঁচ জন মানুষের মতোই তাদের একজন হয়ে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতে চেয়েছেন কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, তিনি মানুষের সংসার রঙ্গমঞ্চের বহির্দ্বারে দাঁড়িয়ে তাঁদেরই আনন্দ বেদনার সংগীত সার্বজনীন অনুভূতিতে সিক্ত করে পরিবেশন করে গেলেন। সংসার রঙ্গমঞ্চের একেবারে মধ্যস্থলে প্রবেশ করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংসার জীবনাভিনয়ে অংশ গ্রহন করে তাঁর সৃষ্ট মানুষকে তিনি আপনা থেকেই বিকশিত হতে দিতে পারেননি। এই ব্যর্থতায় তিনি ব্যথাকাতর হয়েছেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন—'

হে রাজন তুমি আমারে
বাঁশী বাজাবার দিয়াছ যে ভার,
তোমার সিংহ দুয়ারে !

অন্তরের ক্রন্দনে তাঁকে করেছে রোমান্টিক। যেখানেই তাঁর এ-রোমান্টিক মনের ছোঁয়া লেগেছে তা-ই অপরূপ সৌন্দর্য সুষমায় এবং অপরিসীম লাবণ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। নইলে মর্ত্যজীবনে মাধুরী পান করানোর জন্যে তাঁর এমন lyric cry বা অন্তর্বিদারণ শোনা যেতনা :—

শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে
সমস্ত প্রানে কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখি জল।
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা
লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।

কিংবা—

সুখ হাসি হবে আরও উজ্জ্বল

সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহ সুধা মাখা বাস গৃহতল
আরও আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়ন অধরে
আর একটু মধু দিয়ে যাব ভরে
আর একটু স্নেহ শিশু মুখপরে
শিশিরের মত রবে।

শাহাদৎ হোসেনের কবি প্রকৃতি এবং তার মনের কাঠামো যে খাঁটী রোমান্টিক এবং তিনি যে কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথেরই প্রেরণা-পুষ্ট এ দৃষ্টি ভংগী থেকে বিচার করলে তা অত্যন্ত সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র নাথের মতোই তিনি সত্য ও সুন্দরের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করে-ছিলেন। তিনি নিজেকে কল্পলোক বিহারী বলে অভিহিত করেছেন। 'ধরণীর কেন্দ্রকুঞ্জ' তাঁর কাছে প্রবাসভূমি। জীবন ও জগৎকে এ মায়াঞ্জন দিয়ে দেখলে এ দেখার আর শেষ থাকেনা। তখন 'যেন রূপ লাগি আঁখি ঝুরে।'

শাহাদৎ হোসেনেরও তাই :—

"যত দেখি বাড়ে সাধ,
কি অর্বপূ প্রান বসে
হয়ে থাকি ভোর।
অনুভূতি জেগে ওঠে,
শুষ্ক আঁখি ভিজে যায়,
গলে যায় হিয়াখানি মোর।"

এ দেখাতে তো তৃপ্তি নেই :—জীবনকে দেখবার এ নেশা যাকে এক-বার পেয়ে বসে বৈষ্ণব কবির মতোই—

তাঁকেও বলতে হয়

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন ন'তিরপিত ভেল।

শাহাদৎ হোসেনেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখিনা। তিনিও বলেন :—

আজো সে রয়েছে বসি শ্যামল মায়ায়
রূপছবি আঁকিতেছে কল্প তুলিকায়।
(অবতরণিকা)

এ রোমান্টিক মনোবৃত্তির জন্যেই শাহাদৎ হোসেন নজরুলের মতো যুগের চারণ কবি হ'তে পারেননি। মুন্সী মেহেরুল্লা, শেখ আবদুর রহিম মোজাম্মেলহক, ইসমাইল হোসেন শিরাজী, ইয়াকুব আলী চৌধুরী এবং লুৎফর রহমানের মতো এ যুগের বাঙালী মুসলমানের উদ্ভব যুগের ইসলামী সাহিত্য রচনা করতে পারেন নি, সৃষ্টির বেদনায় আধুনিক মুসলমানদের সাহিত্য গুরু মীর মোশরফ হোসেন এবং কায়কোবাদের মতোই মুসলিম ইতিহাসের যে অংশটুকুতে আকৃষ্ট হয়েছেন মুগ্ধ ভৃঙ্গের মতোই সে রস আহরণ করে কাব্যরস পিপাসুদের জন্য বিতরন করে গেছেন।

শাহাদৎ হোসেনের কাব্যে ভাষায় ও ছন্দে একটা অভিজাত মনের পরিচয় আছে। তাঁর কবিতার ভাষায় যে শব্দ চয়ন ও শব্দ যোজনা দেখি তার গাম্ভীর্য ও ধ্বনিব্য না মধুসূদনের Classical ভংগীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুসূদনের মতো তাঁর ভাষা কবি-ভাষা নয়, তাই বলে তাঁর শব্দ গ্রন্থনের দৃঢ বলিষ্ঠ নৈপুণ্য তাঁর কাব্যের নিতান্ত বহিরাবরণ হিসেবেই বিরাজ করছেনা। তিনি তার অনুধ্যেয় এবং ধ্যানলব্ধ জগৎকে যুক্তাক্ষর বহুল তৎসম শব্দের অনুরূপ ধ্বনি স্যংনার মাধ্যমে আশ্চর্য শিল্প কুশলতার সঙ্গে সংগীত মুখর করে তুলেছেন। রবীন্দ্র নাথের romantic মন এবং দেহ গঠনের দিক থেকে মাইকেলের classic পদ্ধতিই তাঁর অনুকরণীয় ও আদর্শ ছিল। রবীন্দ্র প্রভাবান্বিত কবিদের মধ্যে শাহাদৎ হোসেনের বৈশিষ্ট্যও সেখানেই।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে চতুর্থ দশক পর্যন্ত রবীন্দ্র এবং নজরুলের যুগেও তাঁর এ বৈশিষ্ট্য ছিল অক্ষুণ্ণ। তিনি যতবড়ো শব্দ কুশলী কবি ছিলেন, তার সৃষ্ট সাহিত্যে ততটা ব্যাপ্তি ও গম্ভীরতা দেখা যায়না। বাঙলা সহিত্যে তিনি কতকাল টিকে থাকবেন ভাবী কালই তার বিচার করবে। বাঙালী মুসলমানের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির জন্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশাবলীর জন্যে এ যাবৎ যারা নিজেদের উৎসর্গ করে আসছেন অবিসংবাদিত ভাবেই শাহাদৎ হোসেন তাঁদের একজন। আমরা শাহাদৎ হোসেনের যথার্থ মর্যাদা দিতে না পারলেও সে ইতিহাসে শাহাদৎ হোসেনের নাম অম্লান হয়ে থাকবে। এ কালের আমরা শাহাদৎ হোসেনের কণ্ঠ আর শুনবো না, তা চিরদিনের জন্য নীরব হ'য়ে গেছে। যে প্রাণ সদালাপ ও মিষ্ট ভাষণে, নম্র ব্যবহার ও ভদ্রতায়, শালীনরুচি ও গুণগ্রাহিতায় উন্মুখ ছিল সে প্রাণের সাড়া আর পাওয়া যাবেনা। আত্মীয় বন্ধুদের এ-বেদনার সান্ত্বনা কোথায় ?

বাঙলা সনেটের পটভূমি

(ক)

বাঙলা ভাষায় বহু সনেট রচিত হইয়াছে, কিন্তু সনেট সম্বন্ধে আলোচনা খুব বেশী হয় নাই, সুতরাং আমাদের সনেট সম্পর্কীয় আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া আশা করি।

(সনেট কি ভাষায় কি সাহিত্যে ইটালি হইতে উদ্ভূত। সম্ভবতঃ ইটালীয়ান 'Sonetto' (a little sound, ছোট্ট মৃদুধ্বনি) শব্দ হইতে সনেটের উৎপত্তি। সনেট স্বানুভাবাত্মক গীতি কবিতারই অঙ্গীভূত। আদি গীতি কবিতা যেমন বীণা সংযোগে গীত হইত, আদি সনেটও তেমনি মূলতঃ সঙ্গীতরূপে গ্রথিত হইত। গীতি কবিতার অন্তর্গত হইলেও সনেট ভাবে ও গঠনপ্রণালীতে সাধারণ গীতি কবিতা হইতে স্বতন্ত্র। গীতি কবিতায় একটি ভাব নানাপ্রকার বর্ণবৈচিত্র্য লাভ করিতে পারে এবং কল্পনার গাম্ভীর্য ও বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সেখানে একটা অখণ্ড ধ্বনিস্রোত প্রবাহিত হইতে পারে কিন্তু সনেটের ভাবের বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নাই, একটা অর্দ্ধনিরুদ্ধ গভীর ভাব, আন্তর প্রেরণায় পুষ্ট হইয়া অখণ্ড সঙ্গীতধ্বনি সৃষ্টি করিতে পারিলেই হইল। পথিপার্শ্বের অযত্নবিন্যস্ত স্বভাবজ পুষ্পগন্ধের সহিত গীতি কবিতার তুলনা করা যায় কিন্তু সুদক্ষ-হস্তের সযত্নবিন্যস্ত মালঞ্চের পুষ্পসুরভিই সনেটের উপমান।)

(সনেটের গঠন অন্যান্য যে কোন কবিতা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। চতুর্দ্দশ চরণের বিশিষ্ট মিলযুক্ত কাঠামোই সনেটের দেহ-ভাগ গঠন করিয়া থাকে। দেহ এবং আত্মার সার্থক মিলনেই একটা পরিপূর্ণ জীবন। সনেটের চতুর্দ্দশ চরণের নিগড়-বন্ধন শুধু তাহার দেহের বাহ্যিক রূপ নহে; ঐ বন্ধন

তাহার আত্মারও। সনেটের আত্মা কবির মনোগত ভাব। ভাব যত গভীর, জমাট এবং পরিপক্ক হইবে সনেটের বাহ্যিক আবরণও ততই সুসম্বদ্ধ হইয়া উঠিবে। আত্মার স্ফূর্তি যত অধিক, প্রাণশক্তি যত বেশী, তাহার বাহ্যিক আবরণের কঠিন-পীড়নের দীপ্তিও ততই উজ্জ্বল। 'একটা অতি গভীর ভাবনা বা হৃদয়াবেগকে ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশ করিতে হইলে তাহার ক্ষুদ্র হইলে চলিবে না, স্থিতিস্থাপক পদার্থের মত তাহাকে যত চাপিয়া ছোট করা হইবে ততই যেন তাহার সেই সংহত শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই সনেটের নাগপাশের সৃষ্টি।' অন্তর অনুভূতির একটি পরিপূর্ণ ক্ষণমুহূর্তকে চিরস্থায়ী করিতে গিয়া যে নাগপাশের সৃষ্টি করিতে হয় এবং তাহাতে যে একটা অখণ্ড সঙ্গীতস্রোত সৃষ্টি হইয়া থাকে, হইতে পারে আদি সনেট রচয়িতার ইহাই ছিল পরম লোভনীয় বস্তু।)

আদি কবির অনুষ্টুপ ছন্দ হংসমিথুনের একটির বিয়োগ ব্যথায় কবিবরের হৃদয় বিগলিত করিয়া যেমন করুণার উৎসধারায় নিঃসৃত হইয়াছিল তেমনি আদি সনেটও স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমধারায় নিষিক্ত হইয়া ইটালীয় কবি দান্তের লেখনীমুখে সংক্রামিত ও উৎসারিত হইয়াছিল। দান্তের (১২৬৫—১৩২১ খৃ) 'Vitanuova' তে তাঁহার প্রিয়া বিয়াত্রিচের জন্য তিনি তাঁহার হৃদয়ের যে প্রেমগাথা রচনা করিয়াছেন সেখানে ৩১ টি গীতি কবিতার মধ্যে ২৫ টিই সনেট।

(হৃদয় মথিত করিয়া প্রেমের যে মৃদুমধুর গুঞ্জন উত্থিত হয়, যে সূক্ষ্ম ব্যথা ও দীর্ঘ অনুরণন ধ্বনিত হইয়া উঠে এবং যাহার ফলে প্রাণের নিভৃত তন্ত্রীটি গভীর ভাবে আলোড়িত হইয়া যায়, প্রতিভাশালী কবি হৃদয়ের সেই স্নিগ্ধ গাম্ভীর ব্যথাবিহ্বল মধুর ভাবটিকে বাধাহীন ভাষা ও ছন্দে ব্যাপ্ত করিয়া না দিয়া সনেটের ক্ষুদ্র পরিসরে চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহেন। এই জন্যই বোধ হয়, প্রতিভাশালী কবিরা নিজের অতি গোপন, নিভৃত নিঃসঙ্গ বাসনা, অতি গভীর ও আন্তরিক ভাবানুভূতি প্রকাশের পক্ষে সনেটকেই বাহনরূপে

গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অবশ্য প্রেমই সনেটের একমাত্র বিষয়বস্তু নহে। ইউরোপীয় কাব্য-সাহিত্যে প্রেম ছাড়া অন্যান্য বিষয়বস্তুর উপরেও সনেট রচিত হইয়াছে। তবে সেখানেও একটা বৈশিষ্ট্য এই যে সর্বত্র একটা গভীর আবেগ, 'Passion' বা 'sentiment' ই সেই সনেটের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। D. G. Rosseti তাহার 'House of life' এর মুখবন্ধ স্বরূপ যে সনেটটি লিখিয়াছিলেন তাহাতে দেখি—

A sonnet is a moment's monument
Memorial from the soul's eternity
To one dead deathless hour.........
A sonnet is a coin, its face reveals
The soul.

সনেট আন্তর অনুভূতির 'moment's monument' ই বটে।

সনেট প্রসঙ্গে আর একটি কথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। শুধু ভাবগম্ভীরতা এবং আবেগ থাকিলেই সনেট হইবে না, তাহাতে যে কোন উৎকৃষ্ট গীতি কবিতারও জন্ম হইতে পারে। ভাবের গভীরতার সঙ্গে তাহা এমন পুষ্ট হওয়া চাই যে তাহা যেন আপন প্রয়োজনবশে ক্ষুদ্র কলেবরের সনেটের আকার অনুসন্ধান করে। 'Matter' এবং 'Content' এর মধ্যে এমন একটা আসঙ্গলিপ্সা, এমন একটা সঙ্গতি থাকা চাই যে তাহা যেন দেহ ও আত্মার মিলন কামনা করে। ভাবের সঙ্গে রূপের এমন একটা সুসম্বদ্ধ সঙ্গতিই প্রকাশ লাভের জন্য সনেটের কঠিন বন্ধনাগার খুঁজিয়া লয়। এই জন্যই সনেট লেখকের বিশিষ্ট প্রতিভার প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে ইংরাজ সমালোচক Sidney Lee এর মন্তব্য বেশ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন—

"A perfect sonnet is one of the most difficult forms of poetry, only the fullest command of the harmonies of

language and the ripest power of the mental concentration ensure success⋯yet the brevity of the form, the singleness of the idea which all its construction seems to crave, encourages the delusion that it is easy of accomplishment."

উক্ত মন্তব্যের শেষাংশটুকু দেশীয় এবং বিদেশীয় অধিকাংশ সনেট লেখকের পক্ষেই প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম—

দান্তের পরে ইটালীয় সাহিত্যে 'Petrarch' (১৩০৪-১৩৭৪ খৃঃ) সনেট রচনা করেন। দান্তের সনেট হইতে পেটরার্কের সনেটের আকৃতি ও প্রকৃতিতে বেশী পার্থক্য না থাকিলেও পেটরার্ক তাঁহার পূর্ববর্তী কবিবর দান্তের খ্যাতি অনেকখানি ম্লান করিয়া দিয়া আদি সনেট লেখক হিসাবে বিপুল যশ অর্জন করিয়া যান। আজ পর্যন্ত অনেকে তাঁহাকেই আদি ও মূল সনেট রচয়িতা বলিয়া জানেন। তাঁহার সনেটে প্রধানতঃ দুইটি বিভাগ দেখা যায়। প্রথমভাগ প্রত্যেকটি চারি চরণের করিয়া আট চরণের দুইটি শ্লোকে গঠিত। ইহাকে বলা হয় octave বা অষ্টক। ইহার মিল a b b a; a b b a, প্রথম চারি চরণের পরে একটু বিরাম এবং আট চরণের পরে পূর্ণচ্ছেদ। দ্বিতীয়ভাগ 'Sestet' বা 'ষট্ক' নামে পরিচিত। ইহা ছয় চরণে গঠিত। ইহার মধ্যেও দুইটি ভাগ আছে, প্রত্যেকটির নাম ত্রিপদিকা বা 'tercet. ইহার মিল বিন্যাসে কিছু স্বাধীনতা থাকিলেও প্রধানতঃ c d e, c d e বা c d e, d c e বা c d, c d, c d এই মিলে গঠিত হইয়া থাকে। আদি 'Petrarchan' সনেটের মিলবিন্যাসে কিছু রূপভেদ থাকিলেও প্রাগুক্ত রূপই বহু প্রচলিত এবং সমর্থিত। অষ্টক এবং ষটকের দুই ভাগের প্রথম octave বা অষ্টকের মধ্যে একটা অনুভূতি বা ভাবের উদ্বোধন হইবে এবং ষট্কের মধ্যে সেই ভাবই ক্রমশঃ ব্যাখ্যাত বা বিবর্তিত হইবে। Octave এ মোটামুটি ভাবের উত্থান এবং sestetএ সে ভাবেরই ঘনবিন্যস্ত পতন থাকিবে। আদি Petrarchan সনেটের

মূল বৈশিষ্ট্য এইখানেই।

ইটালীয় সনেটের অনুকরণে ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরাজি সাহিত্যে সর্বপ্রথম সনেট রচিত হয়। Thomas Wyatt (১৫০২—১৫৯২) এবং Surrey ইংরাজি সাহিত্যে সনেটের প্রথম উদ্বোধক। তাঁহাদের সমসূত্রে আরও বহু কবি ইংরাজিতে সনেট রচনা করেন। Surrey র পরিত্যক্ত সনেট-তন্ত্রীতে শেক্সপীয়ার সুর যোজনা করেন এবং তাঁহার ভুবনজয়ী প্রতিভার সাহায্যে ইংরাজি সাহিত্যে সনেটের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। শেক্সপীয়ারের এই সনেটগুলিতে তাঁহার একান্ত ভাবানুভূতিমূলক ব্যক্তিনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। শেক্সপীয়ারের সনেট সম্বন্ধে Wordsworth বলিয়াছেন, 'with this key he unlocked his heart,' পেট্রার্কের সনেট হইতে শেক্সপীয়ারের ইংরেজী সনেটের মূলবিন্যাস স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। তাঁহার সনেটে প্রধানতঃ চারি চরণের করিয়া তিনটি Quatrains বা শ্লোক থাকিত এবং পয়ার ছন্দের মত পরস্পর মিলযুক্ত দুইটি চরণে শেষ ধারণা নিবদ্ধ হইত। তাঁহার সনেটের octave এর মিলবিন্যাস হইত a b a b, c d c d, এবং Sestetএ e f e f. g g. ইংরাজি সাহিত্যে শেক্সপিয়ারের সনেট 'irregular বা Shakespearean sonnet নামে পরিচিত। মিলটন পেটরার্ক এবং শেক্সপীয়ারের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন কিন্তু পেট্রার্কের দিকেই তাঁহার লক্ষ্য ছিল বেশী। পরবর্তীকালে Wordsworth এবং Rossetı প্রমুখ বহু রোমান্টিক কবি সনেট রচনা করেন। Wordsworth এর আদর্শ ছিল খাঁটি 'Petrarchan sonnet.' Wordsworth এর ধারাটি অনুসৃত হইয়া তাঁহার ও তাঁহার পরবর্তী যুগে অনেক উৎকৃষ্ট সনেট ইংরাজি সাহিত্যে রচিত হয়।

(খ)

প্রথমদিকে বাঙলা সাহিত্যে সনেট ছিল না: পয়ার, ত্রিপদী পাঁচালী,

লাচাড়ী ইত্যাদি ছন্দই প্রচলিত ছিল। Stanza বা স্তবক বিভাগও বাঙলা পদ্যে পাওয়া যায় নাই। বাঙলা পদ্যে স্তবক বিভাগ কখন হইতে আরম্ভ হয় তাহাও নিশ্চিত বলা যায় না। যদিও ঈশ্বর গুপ্তেই আমরা সর্বপ্রথম স্তবক বিভাগ দেখি। কবিতায় ভাব প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা পূর্ণ দেহ প্রাপ্ত হইলেও সেই ভাবেরও আবার দেহ বিভাগের প্রয়োজন হয়। সেই ভাব দেহের এক একটা ভাগের নামই Stanza বা স্তবক। প্রত্যেকটা স্তবকে যেমন এক একটা ছোট ভাব স্ফুরিত হয় তেমনি একটা পূর্ণ সঙ্গীত-রাগিনী ধ্বনিত হইয়া উঠে। ৪।৮।১২।১৪ কি বা তদধিক চরণের এক একটা স্তবক গঠিত হইয়া থাকে। এই ১৪ চরণের একটা পূর্ণ স্তবককেই সাধারণভাবে সনেট বলা যাইতে পারে।

✓ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালীর প্রাণে ও তাহার সাহিত্যে নব-জীবন সঞ্চারিত হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সাহিত্যের ভাবধারা অল্প কয়েকজন বাঙালীর জীবনে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। এই সময়ে বাঙালীর কাব্য সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে দীক্ষিত হইয়া মহাকাব্য, গীতি-কবিতা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের নব নব অধ্যায় যোজনা করিতে থাকেন। এই সূত্রে তিনিই বাঙলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তন করেন। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার প্রায় সমসাময়িক কালেই মধুসূদনের মনে বাঙলা ভাষায় চতুর্দ্দশপদী কবিতা প্রবর্তিত করিবার অভিলাষ জন্মে কিন্তু তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর অধিকাংশই ফরাসী দেশে অবস্থান কালের রচনা এবং এই চতুর্দশপদী কবিতাবলীই বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার শেষ অর্ঘ্য। যে কবির সংস্কার ছিল বাঙলা ভাষা বর্বরের ভাষা সেই কবিরই উত্তরকালে বাঙলা ভাষায় এমন অধিকার জন্মিয়াছিল যে তিনি বাঙলা সাহিত্যকে নব নব রত্ন-সম্ভারে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ✓

মধুসূদন সনেট রচয়িতা হিসাবে কতটুকু কৃতকার্য হইয়াছেন সে প্রশ্ন

নিরর্থক কারণ প্রত্যেক জিনিষেরই প্রবর্ত্তকের মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে। সেই দিক দিয়া মধুসূদনের সনেটেও যে অনেক ত্রুটি রহিয়াছে তাহা নিশ্চিত কিন্তু তিনি যেমন বাঙলা সাহিত্যে সনেটে একটা মোটামুটি বাহ্যিক রূপের প্রবর্তন করেন, বিষয় বস্তুতেও তেমনি একটা সুস্পষ্ট সঙ্কেত রাখিয়া গিয়াছেন।

সনেট জাতীয় কবিতা কবির ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিরহ-মিলন এবং প্রেমগাথার বিশিষ্টতম অভিব্যক্তির বাহন। মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতা তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। বিদ্রোহী কবি সমাজ ও ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার জন্মগত সংস্কার, পিতৃপিতামহের ইতিকথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তাই ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াও জাতিস্মরভাবে তিনি সেই ইতিবৃত্তকে স্মরণ করিয়াছিলেন এবং কবি হৃদয়ের গূঢ়তম খাঁটি অভিব্যক্তি এক একটি চতুর্দশপদী কবিতার ক্ষুদ্র কলেবরে ধরিয়া রাখিয়াছেন। এই দিক দিয়া 'শাহনামার' কবি ফেরদৌসীর সঙ্গে তাঁহার তুলনা করা যাইতে পারে। ফেরদৌসীর কবিপ্রাণ প্রাগিসলামিক যুগের তাঁহার পূর্ব-পুরুষদের বীর কীর্তি ও বীর গাথা সসম্মানে স্মরণ করিয়াছে এবং প্রাচীন ইরাণের ভাব ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যই অনেকখানি ব্যক্ত করিয়াছে। মধুসূদন স্বধর্ম ও সমাজ ছাড়িয়া, জননী জন্মভূমি ছাড়িয়া সুদূর প্রবাসে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য সকল কাব্যেই তিনি আত্মগোপন করিয়াছেন, কিন্তু এই চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি অনেকটা শেক্সপীয়ারের মতই নিজের হৃদয়কে খুলিয়া ধরিয়াছেন। বাঙলার পূজাপার্বণ, শ্যামা জন্মভূমি, যশোরের কপোতাক্ষনদ, বউ কথা কউ পাখীর ডাক, শ্রীমন্তের টোপর, কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, শ্রীপঞ্চমী, আশ্বিন মাস, বসন্তের একটি পাখী, বিজয়া দশমী, কোজাগর লক্ষ্মী পূজা ইত্যাদি যাহা বাঙালী হিন্দুর একেবারে প্রাণের জিনিষ তাহাই কবির লেখনীতে রূপ পাইয়া মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। বাঙলার কবি

জয়দেব ও ঈশ্বরগুপ্ত, বাঙলার মনীষী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের কথা প্রবাসে তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তু হইয়াছে। বাঙালী কবির কবিপ্রাণ এই চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে একান্ত বাঙালীভাবেই উন্মুক্ত হইয়াছে।

মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতা সনেটের আকারেই চতুর্দশ চরণে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে কিন্তু মিলবিন্যাসে এবং ভাব ও রূপের সুসম্বদ্ধ গাঢ় সন্নিবেশে—সনেটের উৎকৃষ্ট লক্ষণ অনুযায়ী তেমন সনেট হইয়া উঠে নাই। সনেট সম্বন্ধে Theodore Watts Dunton এর বিখ্যাত সনেট হইতে সেই কথাটি—

"A Sonnet is a wave of melody

* * *

A billow of tidal music one and whole"

মধুসূদনের সনেটে দেখিতে পাওয়া যায় না। সনেটের বিধিবদ্ধ নিয়মে মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাকে—অবশ্য অল্পসংখ্যক কয়েকটিকে বাদ দিয়া—সনেট বলা যায় না। তাঁহার 'কাশীরাম দাস' নামক চতুর্দশপদী কবিতাটি গঠনে ও ভাবে খাঁটি সনেটের অনেকটা কাছাকাছি গিয়াছে। এমন আরও দুই চারিটি কবিতার কথা ছাড়িয়া দিলে মধুসূদনের অধিকাংশ চতুর্দ্দশপদী কবিতাই কবিহৃদয়ের ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণার স্বাপ্নভাবাত্মক প্রকাশ হিসাবে উৎকৃষ্ট কবিতা হইয়াছে কিন্তু বিধিবদ্ধ নিয়মে সনেট হয় নাই। অবশ্য সনেটের বাহ্যিক রূপের প্রবর্তক হিসাবে মধুসূদনের কৃতিত্ব যথেষ্টই ছিল এবং থাকিবে। মধুসূদনের এই চতুর্দশপদী কবিতাতেই তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত কবিহৃদয়ের যে দিকটি খুলিয়া ধরিয়াছিলেন পরবর্তীকালের বাঙলা কাব্য সাহিত্যের জন্য সেখানেই যেন একটা মনময়তা বা Subjectivity র গতিপ্রকৃতির স্পষ্ট নিদর্শন ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

মধুসূদনের পরে বাঙলাসাহিত্যে সনেট রচনা করেন দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়-

কুমার, রবীন্দ্রনাথ এবং মোহিতলাল মজুমদার। সনেটে যে নিয়মগুলির কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি সেইদিকে দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার এবং রবীন্দ্রনাথের কাহারও তেমন বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। তাঁহাদের চতুর্দশপদী কবিতাগুলি সুন্দর 'lyric' হইয়াছে কিন্তু খাঁটি সনেট হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথের অধিকাংশ সনেটেই অষ্টক ও ষট্কের একটা স্পষ্ট ভাব রহিয়াছে এবং ভাবের এমন গভীর অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস আছে যে গঠনের পরিপাট্য না থাকিলেও সেগুলিকে আমরা শেক্সপীয়ারের রোমান্টিক সনেটের শ্রেণীতে ফেলিতে পারি। এই যুগে দেবেন্দ্রনাথই সনেটের আকৃতগত বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রাখিয়াছিলেন। তাই তিনি সনেটের নিগড়বন্ধনে তাঁহার কবিপ্রতিভার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। তাঁহার 'অদ্ভুত অভিসার' শীর্ষক কবিতাটি একটা উৎকৃষ্ট সনেট হইয়াছে, পড়িলেই বুঝা যায়।

মাধবের মন্ত্রসিদ্ধ মোহন মুরলী
ধ্বনিল রাধার চিত্ত নিকুঞ্জ মোহনে,
অমনি রাধার আত্মা দ্রুত গেল চলি
শ্যামতীর্থে শ্যামাঙ্গিনী যমুনা সদনে।
গেল রাধা, তবে ঐ মন্থর গমনে
মঞ্জুল বকুল কুঞ্জে কে যায় গো চলি ?
আকুল দুকুল, ম্লান কুন্তল কাঁচলি,
ঘুম যেন লেগে আছে নিঝুম লোচনে।
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া! টানে তরুদল
লুণ্ঠিত অঞ্চল ধরি'। মুখপদ্মপরি
উড়িয়া বসিছে অলি গুঞ্জরি গুঞ্জরি'
বিহ্বলা মেখলা চুম্বে চরণের তল!
আগে আত্মা পিছে দেহ যাইছে তুহার
রাধিকারে। বলিহারি তোর অভিসার।

সনেটের নিখুঁত গঠন পরিপাট্য না থাকিলেও এই সনেটটিতে রাধিকার অভিসার যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে তাহাতে আবেশ বিহ্বলা রাধিকার একটি অতি নিখুঁত ছবি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এই কারণেই দেবেন্দ্রনাথের সনেটকে বাঙলা সাহিত্যে সনেট হিসাবে বরণ করিয়া লইতে পারা যায়।

অক্ষয়কুমার যে কয়টি সনেট লিখিয়াছিলেন সেগুলি পড়িলে মনে হয় বাঙলা সাহিত্যে সনেটের গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে তিনিই সর্বপ্রথম বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে বিষয়বস্তু এবং ভাবের গভীরতা তাঁহার সনেটে তেমনভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। তাই তাঁহার সনেট আকারে সনেট হইলেও ভাবের দিক দিয়া উৎকৃষ্ট সনেট হয় নাই। তথাপি তাঁহার নিম্নলিখিত এই সনেটটি কাহারও মতে ভাবের দিক দিয়াও 'One and whole' হইয়াছে :—

ঈশানচন্দ্র

মথিয়া কবিত্বসিন্ধু বঙ্গকবিগণ
লইল বাঁটিয়া সুধা অমরাবিভব।
রঙ্গলাল নিল শশী নির্মল কিরণ
নিল ঐরাবতে মধু দ্বিতীয় বাসব।
হেম নিল উচ্চৈঃশ্রবা গতি অতুলন,
নবীন ধরিল বক্ষে কৌস্তুভ দুর্লভ।
বিহারী করুণালক্ষ্মী করুণ লোচন,
রবি নিল পারিজাত ত্রিদিব সৌরভ।

তুমি মন্থনের শেষে আসিলে যোগেশ
উঠিল তোমার ভাগ্যে ভীষণ গরল।
কালকূট, কটু গন্ধে সৃষ্টি হয় শেষ
সুর নর যক্ষঃ রক্ষ আতঙ্কে বিহ্বল।

প্রজাপতি যুক্তকর রক্ষ বিশ্বপ্রাণ,
মূর্তিমান প্রেমমন্ত্র সাক্ষাৎ ঈশান।

রবীন্দ্রনাথ অজস্র সনেট রচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'কড়ি ও কোমল', 'চৈতালি' ও 'নৈবেদ্য' সনেটের সমষ্টি। রবীন্দ্রনাথ সনেট রচনা করিতে গিয়া সনেটের বাঁধাধরা নিয়ম কোন স্থানেই মানেন নাই। তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করিয়াছেন। (সনেটের যে নিয়ম আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি সেই নিয়ম না থাকিলে যদি কোন কবিতাকে গূঢ়তর অর্থে সনেট পদবাচ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে আমরা বাধা পাই, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের সনেটও প্রকৃত সনেট হয় নাই।) তবে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রাণের আন্তরিক অনুভূতি, 'lyric' আবেগমণ্ডিত 'Sentiment' ও গভীর উচ্ছ্বাস তাঁহার অধিকাংশ চতুর্দশপদী কবিতাতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। সেইদিক দিয়া তাঁহার অধিকাংশ সনেটই উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা হইয়াছে। কিন্তু গঠনের লঘুত্ব, ভাবের চাপা বন্ধনহীনতা এবং অষ্টক ও ষটকের মধ্যে একটি মাত্র ভাবের উত্থান পতনের নানাপ্রকার বাধায় সেগুলি যথার্থ সনেট হইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ চতুর্দশপদী কবিতাই মিলযুক্ত পয়ার ছন্দনিবদ্ধ ৭টি শ্লোক। কোথাও দুই একটি শ্লোক ছুটিয়া গেলেও তাঁহার ব্যক্তভাবের অঙ্গহানি হইবে না। সনেট বলিতে যদি কতকগুলি নিয়মবদ্ধ কবিতার কথাই আমাদের মনে আসে তাহা হইলে ঐ নিয়মগুলি আমরা যেখানেই পাইব সেই কবিতাকেই আমরা সনেট বলিব অন্যথায় চতুর্দশ লাইনে লিখিত হইলেও আমরা সেগুলিকে চতুর্দশপদী কবিতাই বলিব, সনেট বলিব না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের চতুর্দশপদী কবিতা সম্বন্ধে সনেটের বাহ্যিক আকার থাকিলেও সনেটের প্রশ্নই উঠে না।

মোহিতলাল মজুমদার কবি। কবি হইলেও তিনি একজন সুধীজন-স্বীকৃত সমালোচক। কবিতা লিখার কালেও বোধ হয় তাঁহার সমালোচক মন তাঁহার কবিপ্রাণকে ধরিয়া রাখে। তাই কবিতার বা সাহিত্যসৃষ্টির

যেরূপটি যেখানে যেমন হওয়া উচিত, তাঁহার সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের অভিব্যক্তির মধ্যেও আমরা সেখানে সেইরূপটিই যথাযথ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। অবশ্য অনেকে মনে করিতে পারেন যে কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে কবিহৃদয়ের গাঢ় মিলনকালে কবির সমালোচক মন আসিয়া বাধা দিলে সেখানে আর যাহাই হউক উৎকৃষ্ট কাব্য সৃষ্টি হয় না। কিন্তু আমাদের মনে হয় উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভার যে হৃদয় সেই হৃদয়ের সঙ্গে উৎকৃষ্ট রসপ্রমাতা (Critic) আসিয়া যোগ দিলে সৃষ্টির পথে বাধা বা অন্তরায় উপস্থিত হয় না। রসপ্রমাতা ও কবিহৃদয়ের মিলনরূপপুষ্ট পাকে তরলোচ্ছল ভাববাষ্প সুসংযত ও সুসম্বদ্ধ হইয়া অপরূপ কাব্যরসের সৃষ্টি করে। মোহিতলাল মজুমদার এই শ্রেণীর কবি। বাঙলাসাহিত্যে খাঁটি "Petrarchan" আদর্শে একমাত্র তিনিই সনেট লিখিয়াছেন। তাঁহার সনেটগুলি ভাববস্তুর গাম্ভীর্যে এবং গঠনের পরিপাট্যে বাঙলাসাহিত্যে আদর্শ সনেটের দাবি রাখে। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'পয়ার' শীর্ষক সনেটটি উল্লেখযোগ্য :—

পয়ার

মঞ্জীর খুলিয়া রাখ অয়ি ভাবা ছন্দ বিলাসিনী।
কতকাল নৃত্য করি, ভুলাইবে মধুমত্ত জনে—
দোলাইয়া ফলতনু, ভুরুধনু বাঁকায়ে সঘনে
চপলা চরণ-ভঙ্গে মজাইবে মুদ্রিতা হাসিনী?
আন বীণা সপ্তস্বরা স্বর্ণতন্ত্রী তন্দ্রা বিনাশিনী,
উদার উদাত্তগীতি গাও বসি হৃদপদ্মাসনে
যে বাণী আকাশে উঠে, শিখা যার হোমহুতাশনে,
পশে পুন রসাতলে মানুষের মর্ম্মনিবাসিনী।
করি উচ্চ শঙ্খধ্বনি এনেছিল শ্রীমধুসূদন
পয়ারের মুক্তধারা এ বঙ্গের কপিল আশ্রমে,
'বলাকা'র মুক্তপক্ষ গতিভঙ্গী ধরিয়ানূতন

পশিল সে মহাহর্ষে সঙ্গীতের সাগর সঙ্গমে !
এখনো শুনিব শুধু নির্ঝরের নূপুর নিক্কন ?
কোথায় জাহ্নবীধারা—কূলে যার দেবতারা ভ্রমে ?

এখানে ভাষা ও ছন্দকে তন্বীযুবতীর নৃত্য-চপল গতিভঙ্গীর সঙ্গে তুলনা করিয়া উপমার সাহায্যে প্রথম চারি লাইনে কবি যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, ভাষা ও ছন্দের অনুপম অলঙ্কারে পয়ারের স্নিগ্ধ গম্ভীর উদার উদাত্ত গীতি শ্রবণ মানসে, 'অষ্টকের' সেই নিগড় বন্ধনেই একটা মহীয়ান ভাব কল্পনার উদ্বোধন করিয়াছেন। মানুষের মর্মনিবদ্ধ বাণী গগন স্পর্শ করিবার জন্য তোলপাড় করিয়া ফিরিতেছে।

'ষটকের' মধ্যে অতি কৌশলে এবং দুই একটি কথার সাহায্যে সগর বংশ ধ্বংস এবং তাহার উদ্ধারের জন্য ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের পৌরাণিক আখ্যানভাগ ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ সেই একই ভাব পরিণতি লাভের জন্য দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পয়ারের চটুল নৃত্য ভাঙিয়া মধুসূদন গঙ্গার মুক্তধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বলাকা' কাব্যে পয়ারের সাহায্যেই সাগর গর্জনের অপূর্ব সঙ্গীত ধ্বনি সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি তাই প্রশ্ন করিতেছেন 'এখনও শুনিব শুধু নির্ঝরের নূপুর নিক্কন ? তাহা হইতে পারে না, কারণ পয়ারের সেই বালিকা বয়স অনেকদিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন প্রৌঢ়ত্বজনিত গাম্ভীর্য আগাইয়া আসিতেছে; তাই এখন চাই দিগন্তবিস্তৃত জাহ্নবীর কূলে শান্ত সমাহিত সৌন্দর্য্য।

ইহারই নাম আদি 'পেট্রারকান' আদর্শে রচিত খাঁটী সনেট। ভাব কল্পনার ঐশ্বর্য ভাষা ও ছন্দের গাম্ভীর্যের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া যায় নাই, সজোরে ধৃত হইয়াছে। ভাবের উদ্বর্ত্তন ও নিবর্তন 'অষ্টক' ও 'ষট্‌কের' মধ্যে যথাক্রমে যথাযথ রূপ পাইয়াছে। আবার সবটা মিশিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা অখণ্ড ধ্বনি ও সঙ্গীত-স্রোত উত্থিত হইতেছে।

মধুসূদন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রবীন্দ্রনাথ এবং মোহিতলালের সাধনায় বাঙলার সনেট-সাহিত্য ক্রম পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের পরস্পরের মাঝখানে এবং ইদানীংকালে, বহু কবি সনেট রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদের সনেট কতটুকু সার্থকতা লাভ করিয়াছে তাহা উপরিউক্ত আলোচনা হইতে সহজেই অনুমেয়। উক্ত প্রসঙ্গে সনেট সম্বন্ধে সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের একটি মত উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি বলেন :—সনেটের গঠনের রীতিমত আদর্শের অক্ষরে অক্ষরে পালন খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু তথাপি এ-বিষয়ে কয়েকটি প্রধান নিয়ম না মিলিলে সনেটকে চতুর্দ্দশপদী কবিতা বলিব, সনেট বলিব না। (১) 'অষ্টক' ও 'ষট্‌ক' এই দুই বিভাগ ভাবে ও রূপে স্পষ্ট হওয়া চাই। (২) সমগ্র কবিতাটি 'One and whole' হওয়া চাই। (৩) ভাবের মধ্যে dignity ও repose থাকিবে এবং সেই জন্যই ইংরাজি ভাষার মত বাঙলা ভাষাতেও দ্বৈমাত্রিক বা যুক্তাক্ষর মূলক মিল ব্যবহৃত হইবে না। ইংরাজিতে যাহাকে Close Rhyme বলে সেরূপ মিলও থাকিবে না। প্রথমোক্ত মিলের উদাহরণ যথা গন্ধ, বন্ধ, কন্যায়, বন্যায়। শেষোক্ত মিলের উদাহরণ, উপাদান উপাধান—এইরূপ মিলকে 'Close Rhyme' বলে। সনেটের মিলগুলি খুব স্পষ্ট হওয়া চাই। (৪) সনেটের ভাবও গভীর হইবে, তাহাতে অর্থগৌরব থাকিবে কিন্তু হেঁয়ালী বা ধোঁকা থাকিবে না।

মাসিক মোহাম্মদী,
অগ্রহায়ণ, ১৯৫২।

ঐতিহাসিক উপন্যাস

ঐতিহাসিক উপন্যাস কথাটাই যেন একটু খাপছাড়া গোছের। কারণ আমরা বাহ্যদৃষ্টিতে দেখি যাহা উপন্যাস তাহা ইতিহাস নহে এবং যাহা ইতিহাস তাহা উপন্যাস নহে : অথচ ঐতিহাসিক উপন্যাস নামক অদ্ভুত একপ্রকারের উপন্যাস সাহিত্যজগতে স্থান পাইয়াছে। কেমন করিয়া সেরূপ সম্ভব হয় আমরা তাহাই বলিব।

বিভিন্ন প্রকারের উপন্যাস রহিয়াছে কিন্তু প্রত্যেক প্রকারের উপন্যাসেই মূল বিষয়ে একটা সাদৃশ্য দেখা যায় তাহা মানব জীবন ও জগতের বিচিত্র রহস্য উদ্ঘাটন এবং তজ্জনিত রসসৃষ্টি। ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য কাহিনী বর্ণনা, অতীত ও বর্তমানকে এক সত্যতথ্যের উপরে গড়িয়া তোলা। নিরবচ্ছিন্ন কালস্রোতের মধ্যে পূর্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া মানব জাতির উত্থানপতনের কাহিনীকে এক শৃঙ্খলে গ্রথিত করাই ইতিহাসের কাজ। সেখানে কল্পনার কোন স্থান থাকিবে না—ঔপন্যাসিকের কোন ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ থাকিবে না কিন্তু কোন বৃহত্তম ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িত হইয়া একটা জাতির ভাগ্য উদিত ও অস্তমিত হইবে। এই প্রকারের বস্তু ও তথ্য সত্যের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয় যুক্ত হইয়া যে কাহিনী গড়িয়া তোলে তাহাই ঐতিহাসিক উপন্যাস। বস্তু ও ঘটনা-সত্যের গতিকে সম্পূর্ণ অব্যাহত রাখিয়া উক্ত বস্তু ও ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে যে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য থাকে তাহাকে যথোপযোগী কল্পনার দ্বারা পূরণ করিয়া মানব জীবনের যে কাব্য গড়িয়া তোলা হয় তাহাকেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে।

ইহা যে সম্পূর্ণরূপে কল্পনা হইতে সৃষ্টি করা যায় না এমন নহে। মানুষ শুধু কল্পনা লইয়া বাঁচিতে পারে না, সেও স্বভাবতই সত্যাশ্রয়ী। অতীতের

কোন জনগণবিদিত ঘটনাস্রোতের সঙ্গে কল্পনাকে যদি সুকৌশলে জুড়িয়া দিতে পারা যায় তাহাতে ঘটনাও যেমন মূর্ত্ত হইয়া উঠে কল্পনাও তেমনি স্ফূর্তি লাভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেও তাহা সত্যকার বিশ্বাস ও বিস্ময় উৎপাদন করে। এমনি ভাবে রসের সৃজনই হয় লেখকের উদ্দেশ্য, সেইজন্য ঐতিহাসিক উপকরণ যে পরিমাণে লেখকের রস সৃষ্টির সহায়ক হয়, লেখক তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে লইতে পারেন।

মহাকালস্রোতের মুক্ত ধারায় কত মানুষ তাহার মনুষ্যত্ব ও দৌর্বল্য লইয়া ওঠা-পড়া করিতেছে কেই বা তাহার অনুসন্ধান করে! কিন্তু এই স্রোতের মধ্যে সময়ে সময়ে এমন মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার সঙ্গে এমন ঘটনাস্রোত আসিয়াই যুক্ত হয় যে বহু মানবের ভাগ্য তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ও জড়িত হইয়া থাকে। তাহার সুখদুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত আবদ্ধ হইয়া থাকে। তেমন ব্যক্তির বা তাহার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্য হইতে কোন ব্যক্তির চরিত্র বা তাহার ভাগ্য লইয়া কোন লেখক যদি মানবীয় মহিমামণ্ডিত করিয়া উক্ত জীবনের সর্ববিধ সঙ্গীত রচনা করেন তাহা হইলে পাঠকের কাছে তাহা অতীব আদরণীয় হয় এবং এরূপ সঙ্কর সৃষ্টি সহজেই পাঠকের হৃদয় হরণ করে। এই জন্যই এককালে লেখক ও পাঠক উভয়ের নিকটেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের অতিমাত্রায় সমাদর ছিল।

(অতীত যুগকে ভালোবাসা এবং অতীতের প্রতি মোহ ও আগ্রহ, এই রোমান্টিক মনোবৃত্তি হইতেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টি।)(শুষ্ক নীরস ঘটনাজালে যে অতীত ছিল সমাকীর্ণ তাহাকেই আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া, হৃদয়ের জারকরসে রঙীন করিয়া দেখিবার যে আকাঙ্ক্ষা তাহারই ফলে ইতিহাসের অনুর্বর ভূমিতে উপন্যাসের জীবনরহস্যের ভাব সমাগম।) তাই ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস এবং উপন্যাসের ভাগ পরস্পরের বিরোধী নহে, অধিকন্তু পরস্পরের পরিপূরক। যুদ্ধ বিগ্রহে, বিপদ সঙ্কুল ঘটনার উপলখণ্ডে ইতিহাসে জীবনের ভিতরের যে দ্বন্দ্ব ও অন্তর্বিক্ষোভ

আমরা দেখিতে পাই না, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে জীবন শুধু কর্মের তাড়নায় ও বহির্মুখী ঘটনার প্রাধান্যে ছুটিয়া চলিতে দেখি, শক্তিশালী লেখক সেই ঘটনাস্রোতের অন্তরালে উক্ত জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ, ছোট গান ও ছোট ব্যথা ইত্যাদি মানুষের যাহা শাশ্বত ও চিরন্তন বৃত্তি তাহাকেই রূপ দিয়া একটা পরিপূর্ণ অথচ অসাধারণ মানুষমূর্তি আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত করিয়া তোলেন। কাব্য সাহিত্যের অন্যান্য সৃষ্টি হইতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের এইখানেই শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষের কঠোরতম নিষ্ঠুরতা, অনাবিল স্নিগ্ধ মধুর মহত্ব ও মহনীয়তা, তাহার ভাগ্যের জটিলতম বিকাশ এবং তাহার অসাধারণ মানবতা যাহা অনেকসময়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায়না, কোন একটা বিশিষ্ট যুগের ঐতিহাসিক কোন চরিত্রের মধ্যে প্রতিভাবান লেখক বা কবি নিয়তির এই অদ্ভুত শক্তি ও সৃষ্টির আবিষ্কার করিতে পারেন। (ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাবলীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মানবতার এই মিলনই আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু।) ঐতিহাসিক উপন্যাসের বাহিরের ঘটনাসমূহের রণভূমির জলদগম্ভীর বজ্র নির্ঘোষ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বাত্যাতাড়িত, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রবল তরঙ্গাভিঘাত আর তাহারই অন্তরালে মানবজীবনের মধুরতম বৃত্তি—মানুষের জীবন-নাট্যের এই যে কঠোরে ও কঠোরে, কঠোরে ও কোমলে এবং কোমলে ও কোমলে মিলন ইহার কথা উল্লেখ করিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসকে সমালোচক বাটারফিল্ড মানবজীবনের মহাকাব্য আখ্যা দিয়াছেন। সত্যকারের শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিভার পৌরোহিত্যে যদি উপন্যাস ও ইতিহাস পরস্পর তেমনভাবে-পরিণয়াবদ্ধ হইতে পারে এবং 'Truth is stranger than fiction' ইতিহাসে যদি এই বাক্যের অবকাশ থাকে তাহা হইলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের 'epic of mankind' হইবার পক্ষে কোন অন্তরায় দেখি না।

ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রধানতঃ দুই প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম প্রকার যেখানে ঐতিহাসিক কোন চরিত্রের উল্লেখ নাই, বা উল্লেখ থাকি-

লেও উপন্যাসের প্রধান চরিত্ররূপে নয়। শুধু মাত্র একটা যুগকে চিত্রিত করা এই প্রকার ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য। কোন এক বিশিষ্ট যুগের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, পোষাক পরিচ্ছদ, হাবভাব, কথাবার্ত্তা ইত্যাদিতে ভূষিত করিয়া উক্ত যুগের জীবনের একটা স্ফুট স্পন্দন ধ্বনিত করিয়া তোলাই এই প্রকারের ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাজ—তাহা ইতিহাসের সত্যকে বিক্ষত ও বিকৃত করিয়া নয়, যতদূর সম্ভব সেই সত্যকে অক্ষত রাখিয়া। ইতিহাস এখানে প্রধান অংশ নয়, যুগচিত্রনের জন্য গল্পের সঙ্গে ইতিহাস উপলক্ষ্যভাবে যুক্ত হইয়া থাকে। অবশ্য এমন ঔপন্যাসিকের গতিপ্রকৃতিতে ইতিহাস অনেকটা ভার সদৃশ (burden) হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় প্রকার, বিশিষ্ট যুগের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনার উপরেই উপন্যাস সৃষ্টি করা। ইতিহাস এবং উপন্যাস এখানে এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে, ইতিহাস অংশকে বাদ দিয়া তাহা হইতে উপন্যাস অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া যায় না। এরূপ উপন্যাসে ঔপন্যাসিককে অনেক সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে কাজ করিতে হয় এবং সেই জন্য তাঁহার কল্পনাও অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু যদি ইতিহাসের মধ্যে তেমন উপন্যাস-যোগ্য ঘটনার অবকাশ থাকে তাহা হইলে সত্য ও কল্পনার পরস্পর পরিপূরক সংমিশ্রণের পুষ্ট পাকে অপূর্ব ঐতিহাসিক উপন্যাস গড়িয়া উঠিতে পারে। ইতিহাসের যুদ্ধ বিগ্রহ, বিদ্রোহ, উপদ্রব ও অরাজকতার সময়কে উপন্যাসের প্রচ্ছদপট হিসাবে ব্যবহার করিলে এই প্রকারের উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টি হইতে পারে। ✓

এতদ্ব্যতিরেকে আরও অনেক প্রকার ঐতিহাসিক উপন্যাস দেখা যায়—যেমন কোথাও শুধু উপন্যাসের কল্পনার ভাগই বেশী, কিন্তু মানুষের মনে প্রত্যক্ষ বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য ইতিহাসের একটু গল্পের সঙ্গে তাহার মিশ্রণ ; আবার কোথাও ইতিহাসই প্রধান কিন্তু ঘটনার বিবিধ রন্ধ্র পূরণ করিবার জন্য কল্পনারও যথাবিধি সহায়তা গ্রহণ করা হইতেছে।

এগুলি সত্যকারের ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে, রোমান্টিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন সুলভ রসঘন এক প্রকারের অপরিণত সৃষ্টি।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা বাঞ্ছনীয়। ঐতিহাসিক উপন্যাস যে শ্রেণীরই হউক না কেন ইতিহাসের সর্বজন বিদিত সত্য উপন্যাসে কিছুতেই বিকৃত হইতে পারিবে না, সেই সত্যের এখানে-সেখানে হয়ত কিছু রং লাগিতে পারে কিন্তু রামচন্দ্র যদি পামর হইয়া দাঁড়ান এবং রাক্ষস রাবণকে যদি দেবতা কল্পনা করা হয় তবে আর যাহাই হউক তাহা ঐতিহাসিক উপন্যাস হইবে না। সর্বজনবিদিত সত্যের বিরুদ্ধে লেখকের এই দোষের জন্য তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে শুধুই যে রসভঙ্গ হয় তাহা নহে, পাঠকের মাথায় যেন অকস্মাৎ বাড়ি পড়ে; তাহার আঘাত সে কিছুতেই সামলাইতে পারে না। তখন রস গ্রহণ করা দূরে থাকুক রসভঙ্গের জন্য লেখকের প্রতি পাঠকের মন বিষাইয়া উঠে। তথাপি সহানুভূতিশীল বিরাট প্রতিভায় এমন সৃষ্টিও সম্ভব হয়, কিন্তু তখন পাঠক কি করিবে? সে উপন্যাস পড়িবে, না ইতিহাস পড়িবে? রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তর দিয়াছেন—"দুই-ই পড়ো; সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য উপন্যাস পড়ো, কেননা উপন্যাস বা কাব্যে ভুল শিখিলে ইতিহাসে সেই ভুলের সংশোধন হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইতিহাস পড়িবার সুযোগ পাইবে না, কাব্যই পড়িবে সে হতভাগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি কাব্য পড়িবার অবসর পাইবে না, ইতিহাস পড়িবে, সম্ভবতঃ তাহার ভাগ্য আরও মন্দ।"

মাসিক মোহাম্মদী,
শ্রাবণ, ১৩৫২।

ইসলামের বৈপ্লবিক ভূমিকা

হযরত মুহম্মদ (দঃ) প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের যে রূপ প্রায় সাড়ে তেশ বছর ধরে পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে, ইতিহাসের প্রয়োজনেই তার দ্রুত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। তখন পর্যন্ত হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান প্রভৃতি যে ক'টি ধর্ম পৃথিবীতে নাম করেছিল তাদের আদি বাসভূমিতে উক্ত ধর্ম ও ধর্মানুসারী-দের অবস্থা হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত শোচনীয়। পৃথিবী থেকে ধর্মীয় অধ্যাত্মবাদ লোপ পেতে বসেছিল, সেকালের মানুষের ব্যবহারিক ও সাংসার জীবনের কাহিনীও আশাপ্রদ ছিলনা। গ্রীক, রোম, মিসর, পারস্য, ভারতবর্ষ ও চীন প্রভৃতি দেশের অগণিত জনসাধারণের দুর্দশার সীমা ছিলনা। মানুষের কল্যাণের জন্যই ধর্মের উৎপত্তি অথচ প্রতিদেশেই তখন ধর্ম ছিল সুবিধাবাদী, মুষ্টিমেয় শাস্ত্রাধিকারীর হাতে। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে তারা নিজেদের চরম সুবিধা করে নিয়েছিল নিপীড়িত মানবতা ধর্মাধিকারীদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নও করতো না;—তাদের একচেটিয়া সুখ-সুবিধা ভোগের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রতিকারের আওয়াজ তুলতো না। তাদের সে সাহস লুপ্ত হয়ে গেছিল। অভ্যাসের দাস হিসেবেই প্রত্যেক দেশের সাধারণ মানুষ পতনশীলতার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। লাঞ্ছিত, অবহেলিত পশুজীবন যাপনের মধ্যে এবং পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করতে পারার মধ্যেই ছিল বিপুল জনসাধারণের জীবনের সার্থকতা। পৃথিবীর মধ্য-ভূখণ্ড মধ্য এশিয়ার আরব ভূমিতেই নিরন্ধ্র অন্ধকার বিরাজ করছিল। ধর্মীয় শাসনের সাধু উদ্দেশ্যবাদ সেখানে নষ্ট হয়ে গেছিল; সংসার জীবনে মানবতার আদর্শের ক্ষীণ রশ্মিটুকু পর্যন্ত স্তিমিত হয়ে এসেছিল।

মক্কা ও কাবা ঘরকে কেন্দ্র করে স্মরণাতীত কাল থেকে আরব দেশে

ভারত, পারস্য, আসীরিয়া, সিরিয়া, জেরুজালেম, মিসর, এবিসিনিয়া এবং চীনের ব্যবসা বাণিজ্য চলতো। এর ফলে, আরবের সঙ্গে পৃথিবীর এক বৃহত্তর অংশের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং আরবে সভ্যতার আলোক শিখা জ্বলে উঠলে তা যে সমগ্র পৃথিবীতে সহজে ছড়িয়ে পড়বে তা একরকম অবধারিত ছিল। যুগের প্রয়োজনে তাই দেশি জনবিরল বিরাট প্রান্তর ও বিশাল মরুর দেশ আরব ভূমিতেই হলো কালোপযোগী ইসলামের নবজন্ম। মানব সমাজকে একীভূত করার জন্য নিষ্কলুষ তৌহিদবাদ ইসলামের রুদ্র কঠোর নিনাদ ঘোষিত হলো 'আল্লাহ্ এক ছাড়া দুই নাই।' সমস্ত মানুষই সেই এক আল্লার সন্তান। সুতরাং মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই; মানুষ মাত্রই ভাই ভাই। শুধু নীতির দিক থেকেই নয়, সামাজিক জীবনেও হযরতের নেতৃত্বে ইসলাম অনুসারীরা যখন জগতের কাছে এ দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে তখন ভেদাভেদ পীড়িত পৃথিবীর মানুষ প্রাচ্যের এ নবীন বিশ্বাস বলিষ্ঠ নতুন সভ্যতার দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো এবং মুক্তিকামী মানুষের দল সম্ভাবে এ নতুন ধর্মমতকে সাদরে বরণ করে নিতে লাগলো। আরবভূমি ছিল এ বিশ্বাসের লালন ক্ষেত্র. পৃথিবীর মধ্য ভূভাগে এর প্রতিষ্ঠা ব'লে অত্যল্প সময়ের মধ্যে এখানকার নবলব্ধ মানবতাবাদ উল্কা শিখার মতো চারিদিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেলো।

ইতিহাসের প্রয়োজনেই ইসলামের উদ্ভব আর সীমাহীন দুঃখ দুর্দশায় জগতের মানবতার আকুল ফরিয়াদ হৃদয়ঙ্গম করতে পারার মধ্যেই মহামানব হযরত মুহম্মদের মহানুভবতা। জগতে যত অলৌকিক ঘটনা, ঘটেছে, ইসলামের প্রসার তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ! একথা ভাবলে সত্যি বিস্মিত হয়ে যাই যে, অগাষ্টাসের রোমক সম্রাজ্য যার ট্রাজানের সাহায্যে পরবর্তী যুগে আরও বড় হয়েছিল, সাতশ বছর ধরে বিরাট ও বিখ্যাত জয়ের উপরেই তার ভিত্ গড়ে উঠেছিল, তবু তা একশ বছরেরও কম সময়ে আরব সাম্রাজ্য যে ভাবে কেঁপে উঠেছিল, তার সমকক্ষতা লাভ

করতে পারেনি। প্রায় এক হাজার বছর পারশ্যসাম্রাজ্য রোমের আক্রমণের বিরুদ্ধে টিকেছিল; কিন্তু দশ বছরেরও কম সময়ে ইসলামের তরবারির কাছে তাকে হার মানতে হয়। এ-কথাও সত্য যে কোন বিজিত জাতির সক্রিয় সহানুভূতি কি মৌন উদাসীনতা ছাড়া কোন বিজয়ী জাতিই দীর্ঘকালের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। তাই, যখন দেখি ইসলাম যে দেশে যাচ্ছে সেখানেই পাচ্ছে সাদর সম্ভাষণ তখন তার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি শ্রদ্ধানত হই। মনে মনে প্রশ্ন করি, ইসলামের সে শক্তি কি ছিল? উত্তর পাই সার্বজনীন মানবতা। এই সার্বজনীন মনুষ্যত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই সেদিন 'The spirit of Islam blazed heaven-high from Pekin to Granada.'

ইসলামের গোড়ার দিনগুলো থেকেই দেখি মানুষের জন্য দুটো পথ রচিত হচ্ছে। একটা পারমার্থিক আর একটি লৌকিক। স্বতন্ত্রভাবে যে এ দুটোর রচনা তা নয়, সম্পূর্ণ অঙ্গাঙ্গিজড়িত এ দুই পথ; তবু স্বাভাবিক দিক থেকে স্বতন্ত্রভাবেই এর বৃদ্ধি। ধর্ম-জীবনের সাধন পালনের জন্য যে devotion বা প্রগাঢ় অনুরাগের প্রয়োজন, 'দীনে'র (ধর্মের) প্রকৃষ্ট পরিচর্যার জন্য ইসলাম তার যথাযথ স্বীকৃতি দিয়েছে। স্বয়ং হযরতের কথা বাদই দিলাম; কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদিনের যে-কারুর ধর্ম জীবন থেকেই তার প্রচুর নজীর পাওয়া যাবে। রসুলের বাণী—'যখন দীনই আমল হাসেল করবে তখন মনে করো আল্লাহ্‌কে তুমি দেখছো, আর তা যদি না হয়, তা হ'লে মনে করো আল্লাহ্‌ তোমাকে দেখছেন; কিন্তু দুনিয়ার কাজ করতে গিয়ে মনে করো তুমি অজর অমর। হযরত আলীর জীবন থেকেই এর চূড়ান্ত উদাহরণ পাওয়া যায়। কোন এক যুদ্ধে তাঁর পায়ে তীর গেঁথে যায়। তিনি যন্ত্রনায় কাতর হয়ে পড়েন। বের করতে গেলে কিছুতেই তিনি তা বের করতে দেন না। অন্যান্য সাহাবীরা পরামর্শ করে স্থির করলেন যখন তিনি নামাযে দাঁড়াবেন তখন সেটা টেনে ফেলতে

হবে। যেই পরামর্শ সেই কাজ। হযরত আলী নামাজ পড়ছেন—জগৎ ভুলে গিয়ে তিনি আল্লার সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করছেন। তাঁর পা থেকে তীর টেনে বের করে নেওয়া হলো। তিনি বিন্দুবিসর্গ কিছু জানতে পারলেন না। নামাজের মধ্যে তথা দীন্‌ই আমলে কি অবিচলিত নিষ্ঠা, কি একাগ্রতা, আল্লাহ্‌তে মশগুল হয়ে ঐশ্বরিক শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চরের কি অপূর্ব আদর্শবাদ! অথচ ইনি ছিলেন 'শেরে খোদা', সাংসারিক কূট-বুদ্ধিতে, বীর্যবত্তায়, শরীর রক্ষায়, শৌর্যে ও বীর্যে ইসলামের ইতিহাসে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। ইহ ও পরকালের সাধন-পদ্ধতির যে-রূপ ইসলাম জগৎবাসীর কাছে তুলে ধরেছে হযরতের সমকালীন এহেন যে-কোন সাহাবীর জীবনই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হজের মর্মস্পর্শী বাণীতেও দীন-দুনিয়ার সমন্বয় সাধনের অপরূপ নির্দেশ দেখা যায়। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে কি সুন্দর আবেগপ্রবণ ও মর্মস্পর্শী ভাষায় মুসলিম জামায়াত তথা মানব সমাজকে লক্ষ্য করে মানুষ-মাত্রেরই জান, মাল ও ইজ্জত রক্ষা করার জন্য তাঁকে আকুল ফরিয়াদ করতে শুনি। জাতিভেদপীড়িত এক কালের বাঙলার কবি মানবতার প্রতি ইসলামের এমন সম্মান দেখেই হয়ত গেয়েছিলেন "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" জান, মাল ও ইজ্জত রক্ষার যে নির্দেশ হযরত সেদিন দিয়েছিলেন, আধুনিক জগতের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ তার চেয়ে যে বড়ো তা মনে হয় না।

সেদিন হযরতের দ্বিতীয় নির্দেশ ছিল নারীর প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য। তাঁর পূর্বে সৃষ্টির উৎস-রূপিনী নারী জাতির উপরে যে অবিচার হয়ে এসেছিল তিনি অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান পুরুষ সমাজকে লক্ষ্য করে তাই সেদিন বলেছিলেন, 'পুরুষের অধীনস্থ আল্লার সৃষ্টি নারীজাতির প্রতি সংসার জীবনের নানা সম্বন্ধে ও ব্যবহারে ক্ষমাসুন্দর, প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে ধরতে।' এমনি করে দেখতে পাই কোরান প্রবর্তিত পথে লাঞ্ছিতা নারী

জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার ইংগিত দিয়ে তিনি মানব সমাজের বিপুল অংশকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছিলেন।

সামাজিক কল্যাণের আদর্শও সেদিন তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই তিনি যেমন সেদিন সজোরে ঘোষণা করে গেলেন সুদ দেওয়া নেওয়ার বিরুদ্ধে তাঁর কঠিনতম অভিমত, তেমনি প্রাক্-ইসলামিক যুগের জিলক দ, জিলহজ্, মহরম ও রজবের মাস গুলোতে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ রাখার আরব-জগতের চিরাচরিত প্রথাকে আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা দিয়ে ইসলামের যুগেও তার রেওয়াজ অপ্রতিহত রাখবার বাসনা পোষণ করলেন। সর্বকালের মনুষ্যের মহত্তম কল্যাণের পথ মহামানবের অন্তরের আলোকে, বাস্তববুদ্ধি ও তীক্ষ্ণতম মর্মবোধ অনাবিল ভাষাস্রোতে সেদিন এমনিভাবে স্বতোৎসারিত হয়েছিল। সংসার ও সমাজ জীবনে সুষ্ঠুভাবে চলার বিধান এ কয়টি কথাতেই প্রকৃষ্টভাবে রূপ পেয়েছিল। শান্তির ধর্ম ইসলামের মহানবী, সংসার জীবনে মানবতার চলার পথে এমনিভাবে বাস্তবতার ইংগিত রেখে গেছিলেন। বিভিন্ন দেশের মানুষ তাতেই হয়েছিল আকৃষ্ট। বুদ্ধি ও চেতনার জগতে তাতেই এসেছিল আলোড়ন।

ইসলাম কোনদিনই সন্ন্যাসবাদের সমর্থন করেনি। আবশ্যক প্রতিদিনের ধর্মাচার পালনগুলি ও কঠোর নিয়মানুশাসনের মধ্যেই দিন ও দুনিয়ার সুশৃঙ্খল জীবিকা ও পুণ্য সঞ্চয়ের অশেষ ইংগিত রেখে গেছে। সুরা জুমআর মধ্যে জুমআর দিনে নামাযের আজান শুনে বেচাকেনা তথা দুনিয়াদারী ফেলে উর্দ্ধশ্বাসে মসজিদের দিকে ছুটে চলার নির্দেশ কোরানে আছে আবার নামাজ শেষে সৎপথে জীবিকা অর্জন বা সংসার-ধর্ম পালনের জন্য সংসারে ছড়িয়ে পড়ার ইংগিতও কোরান মানুষকে দিয়েছে। সংসারে থেকে সুস্থবুদ্ধির সাহায্যে জীবনধর্ম প্রতিপালন ও পারলৌকিক পাথেয়-সঞ্চয়ের এমন বিধি-ব্যবস্থা পৃথিবীতে ইসলাম মানুষকে এনে দিলো যে এরই ফলে তার ইতিহাসের প্রথম দিকে মুসলমানেরা হেলায় করলো জগৎ জয়।

নামাযান্তে মুসলমান খোদার কাছে প্রার্থনা করে 'রাব্বানা আ'তেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখেরাতে হাসানাতাঁও'—ইহলোক ও পরলোকের সারাংশ হে খোদা, আমাদের উপভোগ করতে দাও। শুধু প্রার্থনামাত্র নয় ইসলামের প্রথম দিকের ইতিহাসে দেখি বীরভোগ্য বসুন্ধরার সারাৎসার পাওয়ার জন্য নিজেদের সর্ববিষয়ে তৈরী করেছে মুসলমানরা। সংপথে দুনিয়াকে উপভোগ করে গেলে পরলোকের বেহেস্তের মেওয়া ও হুর-গেলেমান তাও যে তাদের কপালে জুটবে এ অবশ্য অবধারিত। তাই দেখি, সেকালের মুসলমানেরা অবাধে দুনিয়ায় বাদশাহী করলো লৌহশাসন চালিয়ে নয়—শাসনাধীন মানুষের চিত্ত জয় করে।

প্রথম দিকে ইসলাম তার সমাজ ও রাজনীতিসম্মত সুস্থ বিচারগ্রাহ্য তৌহিদবাদের সাহায্যে এবং সাম্য-মৈত্রীর বাণী প্রচারজনিত তার অন্তর্নিহিত মৌলিক শক্তির জন্যই অমুসলিম জগৎবাসীর চিত্ত আকৃষ্ট করে তুললো। এমনিভাবে নিজের ভিত শক্ত করে জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির রাজ্য করায়ত্ত করার জন্য অতঃপর ইসলামের জয়যাত্রা শুরু হলো। আব্বাসীয়, ফাতেমীয় এবং ওমাইয়া বংশীয় সুলতানদের গৌরবোজ্জল শাসন ব্যবস্থায় এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেনে যথাক্রমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বহুল প্রসার দেখা যায়। সমরখন্দ ও বোখারা থেকে ফেজ এবং কর্ডোভা পর্যন্ত এ বিস্তৃত ভূখণ্ডে অগণিত পণ্ডিতব্যক্তি, জ্যোতিবিদ্যা, গণিতবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং সংগীতবিদ্যায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। প্রাচীন গ্রীসের সাধকেরা জ্ঞানের যে আলোকবর্তিকা জ্বেলে রেখে গিয়েছিল, তা ইসলাম অনুসারীদের হাতে নতুন প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠলো। প্লেটো এ্যারিষ্টটল, হিপারকাস, হিপোক্রেটস, গ্যালেন, ইউক্লিড, এ্যাপোলোনিয়াস এবং টলেমি প্রমুখ গ্রীক মনীষীদের গ্রন্থরাজি আরবীতে অনুদিত হলো এবং মুসলিম জগতে দর্শনশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের রীতিমতচর্চা হতে লাগলো। আলকান্দি, আলহামান,

আলফারাবি, ইবনেসিনা, আলগাজ্জালী, আবুবকর, ইবনে বাজ্জা, আলবিত্তরুজী, ইবনে খলদুন ও ইবনে রুশদ প্রমুখ মনীষীগণ মনুষ্য সভ্যতার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক শাখায় যে সাধনা করে গেলেন আধুনিক ইয়োরোপ উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁদের সাধনালব্ধ সে অমৃতের সাক্ষাৎ পেয়ে জগতের উপরে কর্তৃত্ব করে যাচ্ছে। খৃষ্টীয় অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের উপরোক্ত মনীষীগণ মানব সভ্যতাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁদের দান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জাগতিক নিয়মানুযায়ী জাতির উত্থান ও পতন হয় কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতির উন্নতির দিনে যে দান সে করে যেতে পারে, তা দিয়ে পৃথিবীর সভ্যতার মধ্যযুগে ইসলাম উক্ত মনীষীদের সাহায্যে দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীত ও চারুশিল্পে পৃথিবীকে দান করেছে, বর্তমানকালের সমগ্র মানবতা সে পথ ধরেই উন্নতির শিখরে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে।

ইসলামের বৈপ্লবিকতার মূলে ছিল সুস্থ মানবতাবোধ, মুক্তবুদ্ধি নৈতিক দৃষ্টিভংগী, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারহীনতা, আত্ম-জিজ্ঞাসার তাগিদ, বিচারসহমান, বৈজ্ঞাকি অনুসন্ধিৎসা ও পরীক্ষা পদ্ধতি এবং যুক্তিবাদের অবতারণা। মুক্তকণ্ঠে সার্বজনীন মানবতার জয় ঘোষণা করার জন্য পৃথিবীর যে-কোন সভ্যতাই গর্ববোধ করতে পারে; কিন্তু জগৎব্যাপী আদর্শ বিচ্যুতির যুগে ইসলাম মানব সভ্যতাকে দ্রুত এগিয়ে দেবার জন্য যে এতগুলো বৈজ্ঞানিক মীমাংসাবাদের অবতারণা করলো, সর্বোপরি মানুষকে মানুষ হিসেবেই তার সর্বনিম্ন অধিকার সম্বন্ধে যে ভাবে সচেতন করে দিয়ে গেলো তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে ইসলামের বৈপ্লবিকতার বীজ। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য আজ জগৎজোড়া অভিযান শুরু হয়েছে। স্বাধীনতা, সাম্য ও মানবতার মুক্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য একদিন ফরাসী বিপ্লবও সাধিত হয়েছিল। তার ফলে, সমগ্র ইয়োরোপ কেঁপে যায়; এমনকি রুশ বিপ্লবও সেই মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠার জন্যই সংঘটিত হয়ে গেলো। আজও দেখি বঞ্চিত মানবতা

পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আঙুল উঁচিয়ে রয়েছে। এ সবের মূলে যে চিন্তাধারা ও আত্ম জিজ্ঞাসা রয়েছে তার উৎস ইসলামের সেই আদিম জীবনবাদের মধ্যেই সুগ্রথিত ছিল। পৃথিবীতে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হতেই থাকবে, মানবতার প্রাণচঞ্চল সজীবতার লক্ষণই বিপ্লবাত্মক স্পৃহা ও অগ্রগতির মধ্যে। কিন্তু একথা সত্য অতীত, বর্তমান ও অনাগত কালের সকল বিপ্লবের সেরা বিপ্লবই হলো ইসলামের ঐতিহাসিক উত্থান ও প্রসার, তার মধ্যেই চিরকালীন বিপ্লবের অত্যদ্ভুত ইংগিত রয়ে গেছে।

(রাজশক্তি অবলম্বন করে ইসলাম যখন ভারতবর্ষে আসে তখন অবশ্য ইসলামের আদি উত্তাপ ও জৌলুস অনেকখানি শ্রীভ্রষ্ট হয়ে যায়। তবু ব্রাহ্মণ্যবাদের উৎপীড়ন ও সুবিধাবাদী উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নির্যাতনে জাতি-ভেদ জর্জরিত ভারতীয় সমাজ-জীবন ইসলামের উদার নৈতিক ও সাম্য-বন্ধন শাসিত নিয়ম-নিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি। ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতই ছিল উপযুক্ত কর্ষণক্ষেত্র; কিন্তু রাজশক্তির দিক থেকে ভারতে ইসলাম প্রচারের কোন ব্যবস্থাই হয়নি। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে ইতিহাস পড়লে ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে চিন্তা করলে এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। তার বড়ো নজীরই হলো যুক্তপ্রদেশ। দিল্লী আগ্রা মুসলিম রাজশক্তির সাতশ' বছরের লীলাভূমি অথচ সেখানেও মুসলমানরা সংখ্যালঘুই রয়ে গেছে। এতৎসত্ত্বেও যে ভারতবর্ষে ইসলামের এত অধিক গুণগ্রাহী ও অনুসারী দেখা যায়, তার কারণ ইসলামের বৈপ্লবিকতা, মানুষকে মানুষের মর্যদা ও স্বীকৃতি দান। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ ভারতীয় সমাজ জীবনকে জীর্ণ করে ফেলেছিল। সেকালে মনুষ্যত্বের ক্ষীণতম অধিকার বঞ্চিত অগণিত ভারতবাসী তাই দেখি দলে দলে ইসলা-মের ছায়াশীতল পতাকার নীচে সমবেত হলো; সমাজ জীবনে পেলো মুক্তি ও মানুষ হিসেবে মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠা।

আর যাই হোক ভারতের একটা প্রাচীন সভ্যতা ছিল। তার মূল

অত্যন্ত গভীর। সে জন্যেই ইসলামের পূর্বে এ মাটিতে বিদেশ থেকে যারাই পা দিয়েছে তারাই কালক্রমে ভারতের দর্শনস্নাত সভ্যতার মধ্যে আত্ম-পরিচয় বর্জন করে মিশে গেছে। গ্রীক ও শক হুনদের ইতিহাস হলো এই। ধর্ম হিসাবে জড়বাদের অত্যন্ত অনুকূল হলো ইসলাম। তার গতি নিয়ামক পবিত্র গ্রন্থ কোরান, এক আল্লাহ ও নির্দিষ্ট রসুল এবং তার সুস্থ সমাজ চেতনার প্রাঞ্জল রূপের জন্যই ভারতবর্ষ ইসলাম অনুসারীদেরকে নিজের মধ্যে টেনে নিতে পারেনি বরং ইসলামই ভারতীয় সামাজিক জীবন পদ্ধতির দুর্বলতার জন্য তারই ভিত্তিমূল ক্ষয় করে দিয়েছে। ইসলামের এত বড় বিপ্লবাত্মক গতির সামনে পরে ভারতও তার উগ্রতা কিছু পরিমাণে পরিহার করতে বাধ্য হয়েছে। ইসলামের সাংস্কৃতিক দীর্ঘ বিজয়ের হাত থেকে হিন্দুদের বাঁচানোর জন্যই ভারতীয় দর্শনের ইসলামের অনুকূল ব্যাখ্যা দিয়েছেন শঙ্করাচার্য। সাম্যমৈত্রীর প্রতিষ্ঠা ও মানুষের অধিকারে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে প্রতিষ্ঠাদানের জন্যই ভারতের মধ্যযুগে উদ্ভব হয়েছে রামানন্দ, কবীর, মীরা, নানক, দাদু ও শ্রীচৈতন্যের। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহনের যে হিন্দু ধর্ম সংস্কার আন্দোলন, কেশব চন্দ্রের নববিধানের পরিকল্পনা, দয়ানন্দের আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের প্রয়াস এবং বিংশ শতাব্দীর মহাত্মা গান্ধীর হরিজন তোষণ ও শুদ্ধির আন্দোলন—এ সবের মূলেই ইসলামের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বৈপ্লবিক প্রভাব দেখতে পাই।)

(ভারতবর্ষ তার অজ্ঞাতসারে ইসলামিক সংস্কৃতির বহু কিছু আত্মসাৎ করেছে এবং পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সংমিশ্রন ও নানা দিকে নানা ভাবে ঘটেছে তবু একথা সত্য যে, ইসলামের সভ্যতার গৌরব বুকে ধারণ করেই ইয়োরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর দিশারী হয়ে উঠলো অথচ উত্তরাধিকার সূত্রে মানব সভ্যতার এ আশীষ হাতে পাওয়া সত্ত্বেও ইসলামিক সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতা বশতঃ সজ্ঞানে ভারতবর্ষ তাকে বর্জন

করেছে এবং ভারত ভূমি থেকে তাকে চিরতরে উৎখাত করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। ইংরেজ আমলের শেষ একশ বছরের নিছক ভারতীয় তথা হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন প্রয়াসের মধ্যেই আমাদের এ উক্তির সত্যতা যথার্থ অনুধাবন করা যাবে। ভারতের পক্ষে তার ফল শুভ হয়নি। রাজ্য-হারা উৎপীড়িত ভারতীয় মুসলমান ভারত ভূমিতেই ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখার ঐকান্তিক দাবী ভুলে ক'রে নিয়েছে আপন আবাসভূমি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা।

যে শক্তিতে ইসলাম একদিন পৃথিবীতে বিদ্যুৎগতিতে বিস্তারিত হয়েছিল, পাকিস্তানের মুসলমানেরা সেই শক্তিতেই পাকিস্তানের সত্যকার দারুল ইসলামে পরিণত করুক। জানি, অতীত তার পুরোদস্তুর রূপ নিয়ে বর্তমানে কোন দিনই ফিরে আসে না; কিন্তু এও সত্য যে, অতীতের গোপন পদসঞ্চারণের পথ ধরেই বর্তমান তার ইতিহাস রচনা করে। পাকিস্তানে খাঁটি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক। তার বৈপ্লবিক রূপ ফিরে আসুক। তাহলে দেখবো হিন্দুস্থানে যে হতভাগ্য মুসলমানেরা রয়ে গেছে তাদের এবং সেখানকার হিন্দুদের কল্যাণ হবে, পার্শ্ববর্তী পাকিস্তান রাষ্ট্রের মানবতাবাদের ছোঁয়া লেগে হিন্দুস্থানও শুচি-বায়ু-গ্রস্ত অনুদার পঙ্গু মানসিকতা থেকে মুক্তিলাভ করবে। পাকিস্তান থেকে ইসলামের বিলম্বিত রেনেসাঁর শুরু হোক! যুদ্ধ-জর্জরিত পৃথিবীতে মজলুম মানবতা ইসলামের আদি স্বরূপে অবগাহন করে শান্ত হয়ে উঠুক।

মাহেনও,
নভেম্বর, ১৯৫০।

ইসলামে শাসন-সংহতি

ইসলাম ধর্মের প্রত্যেক অনুষ্ঠের বিষয়কর্মের মধ্যে এমন একটি মৌন গাম্ভীর্য ও সুসংযত শৃঙ্খলা রহিয়াছে যে, বহির্দৃষ্টিতে প্রথমতঃ তাহা উক্ত ধর্মের তথাকথিত অনুশীলনকারীর চোখে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে বিসদৃশ ঠেকিলেও জ্ঞানী ও প্রকৃত মুসলিমের নিকট শৃঙ্খলার উক্ত নিগড়-বন্ধনই মনুষ্য-জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে চালিত করিবার জন্য প্রেরণার একমাত্র উৎসরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। প্রাতিদিনের ওজু ও নামাজের মধ্যে যে স্বল্প শৃঙ্খলা রহিয়াছে, তাহাই মানুষকে যেমন বৃহত্তর শৃঙ্খল পরিবাব জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে, তেমনই বৃহৎ শৃঙ্খলের মধ্যে বৃহত্তর মুক্তির সন্ধানও দিয়া থাকে। শিল্প বা আর্টের পটভূমিতে যে কয়েকটি বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ব্যক্তির সৌন্দর্যানুভূতি ও আত্মার মুক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে—সেই সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রভৃতির মধ্যেও আমরা নিয়মেরই সুসঙ্গতি দেখি। নিয়ম যেখানে যত সুন্দররূপে ধরা দিয়েছে, দেহের ছাঁদ ও লীলা নপুণ্য যত বঙ্কিম ভঙ্গিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, রূপের তারণ্য যেখানে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে সেই শিল্প-আত্মাও উন্মুক্ত ও প্রসারিত হইবে, একথা অবধারিত। গঠন-সৌন্দর্য ব্যতিরেকে কোন বড় জিনিষ দাঁড়াইতে পারে না, আত্মার সৌন্দর্য যখন শতরূপে উদ্ভাসিত, তখন সেই আত্মাব আধার দেহ যে কদর্য হইবে, তা' কেহ কল্পনা করিতে পারেন না। নিয়ম শৃঙ্খল বা নিয়ম সুষমা সেই দেহকে আত্মার লাবণ্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বাহিক সৌন্দর্য দান করিয়া থাকে, শিল্পের ক্ষেত্রে এমনতর বিকাশই সাধারণতঃ আমরা দেখিয়া থাকি।

ধর্ম ও শিল্পের সামঞ্জস্য সাধারণের কাছে বিসদৃশ ঠেকিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু শিল্পের মধ্যে যে সংযত-শক্তি শিল্পকে বড় করিয়া তোলে, ধর্মের

মধ্যেও সেই কঠিন সংহত নিয়ম সংযম বা কঠিন চরণ-নিগড়ই ধর্মের প্রাণ-শক্তিকে স্থায়ী ও অটুট রাখিতে এবং যুগাতীত করিয়া তুলিতে সহায়তা করে। ইসলামের দৈনন্দিন অনুষ্ঠেয় ক্রিয়া-কর্ম এবং বৃহৎ পরবাদির মধ্যে আমরা কোথায় কি শৃঙ্খল সৌন্দর্য অবলোকন করি, আপাততঃ তাহাই বলিতেছি।)

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া সংসারে লিপ্ত হইবার পূর্বে খোদার নিকট প্রার্থনা করিয়া লইলাম। সেই প্রার্থনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইলাম বিধি-সংগত ভাবে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া। খোদাওন্দের নিকট আমার আত্মাকে সমর্পন করিবার পূর্বে দেহকে পবিত্র করিয়া লইব, তাহাতে বিচিত্র কি? ওজু বা ইসলামের বিধি-সংহত হস্তমুখ প্রক্ষালন ও পদদ্বয় ধৌতকরণ আত্মার পবিত্রতার বহির্বিকাশ। অতঃপর ফজরের নামাজ বা উষাকালীন প্রার্থনা। সারাদিন সংসারে নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিতে গিয়া মানবাত্মার যে শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তি লাভের জন্য দিবা সমাগমের প্রথম মাহেন্দ্রক্ষণে মহাশক্তিশালী পরমাত্মার মিলন কামনায় মানবাত্মার অভিসার-যাত্রা। ইহারই নাম: প্রাতঃকালীন প্রার্থনা। এই প্রার্থনা বা আত্মসমাহিত ভাবের ভিতর দিয়া মানুষ পরমাত্মার নিকট হইতে যে শক্তি সঞ্চয় করে, তাহাই তাহাকে সারাদিনের সকল ক্রিয়াকার্মের মধ্যে প্রেরণা যোগাইয়া থাকে। তুমি মুস্‌লিম, তোমাকে প্রতিদিনের জীবন-প্রভাতে প্রার্থনা করিতে হইবে। এই নিয়মে ধরা দিয়া, নিয়মাতীতের—যোগাতীতের সন্ধান লাভ করিতে হইবে।

দিবসে জীবন-যুদ্ধের তাড়নায় মানুষ যখন সারাক্ষণ নানাকর্মে রত রহিয়াছে—সংসার যখন তাহাকে চিন্তাজালে জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে, বিষয়বুদ্ধির সৌজন্যে, লাভক্ষতির চরম মীমাংসায় যখন সে দিকভ্রান্ত দিশাহারা হইয়া সংসারকে ভীষণভাবে কামড়াইয়া ধরিতেছে, তখন দূর মসজিদ হইতে পর্যায়ক্রমে মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নের মধুর আজানধ্বনি ভাসিয়া

আসিতেছে : 'তিনিই শ্রেয়, তিনিই শ্রেষ্ঠ! এস মানুষ! যাহার মীমাংসা তুমি এতক্ষণ করিতে পারিলে না, যে সংসার তোমাকে পদে পদে দিক্ ভুলাইল, তাহাকেই আবার নিষ্কম্পচিত্তে গ্রহণ করিবার জন্য অরূপ-রতনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লও। সেই মহাশক্তির মধ্যে আত্মনিমজ্জিত করিয়া প্রশান্ত জ্যোতিতে তোমার আত্মাকে উদ্ভাসিত করিয়া তোল, দিনের অবশিষ্টাংশটুকু নির্ভয়ে কাটাইতে পারিবে। তুমি মুস্‌লিম, তুমি এই ডাকে সাড়া দিবে না? নিয়মের এই শৃঙ্খল পরিবে না?'

'দিনান্তে দিগ্‌দিগন্ত মৌন অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া আসিতেছে, অন্তিম রাগ-রঞ্জিত রবি এপার হইতে ওপারে পাড়ি দিবার আয়োজন করিতেছে, সন্ধ্যার অবনমিত আলস্যজড়িত অন্ধকারে পার্থিব প্রতি ধূলিকণা কোন মোহন মহোৎসবের মত্ত উল্লাসে কাহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। হে মানব, ত্বরা কর, সূর্যাস্তের সঙ্গে তোমার আত্মাকেও একবার সেই শক্তির সঙ্গে মিলিত করিয়া লও, পূর্ণ মিলনানন্দে দেখ সেখানে কতো শান্তি, কতো তৃপ্তি।'

রাত্রি প্রহরাতীত হইয়া আসিতেছে, প্রকৃতি বহুক্ষণ শান্ত ভাবধারণ করিয়াছে। চারিদিকে চিরযামিনী নীরব নিথর হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। তুমি এই অবসরে আপন প্রার্থনা সারিয়া লও। যে পূর্ণানন্দে প্রভাত হইতে এ-পর্যন্ত কাটাইলে, তাহারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িবার পূর্বে, অজ্ঞাত অবস্থায় কৃমিকীট বিশিষ্ট দেহকে সমর্পণ করিবার প্রাক্কালে—এ জীবনে যে রূপরস পান করিয়া গেলে, তাহার আনন্দ প্রকাশকল্পে সেই আনন্দদাতার গুণগান কর; কারণ তুমি জাননা তোমার জীবনে আগামীকাল আসিবে কিনা! এই জীবনের সুখদুঃখ আনন্দ ও বেদনাদাতার ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য রাত্রির ঘনান্ধ-কারে সেই পরমপুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ কর—একবার কাঁদিয়া বলো : 'সংসারের বাধা-বন্ধন,—মায়া-মমতা হইতে অসম্পৃক্ত রাখিয়া' যে ভাবে আমার জীবন কাটাইয়া দিয়া আজিকে আবার তোমার সম্মুখে লইয়া

আসিয়াছ, তাহারই জন্য তোমার কাছে আমার এই নতি স্বীকার।—জীবনের সর্বদুঃখ, সর্বগ্লানি তোমাতেই সমর্পণ করিবার জন্য আমার এই অশেষ কাতরতা!

পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার যোগস্থাপন মানসে প্রাতিদিবসের পৌনঃ-পুনিক এই মহাসুযোগ, ইহাকে নিতান্ত বাঁধাধরা নিয়ম-শৃঙ্খল বলিয়া, সংসারের বাহ্যিক বিষয়-মোহে মত্ত থাকিয়া হেলায় হারাইবে? তুমি মুসলিম, তুমি তাহা পার না। সংসারে থাকিয়া সংসারাতীতকে পাইবার জন্য সুযোগের শৃঙ্খল পরিধান কর—উভয় কূল বজায় থাকিবে।

প্রাতিদিনের পাঁচ ওয়াক্তের এই নামাজে যে শৃঙ্খলা দেখি, তাহা যেমন সংসার কর্মনিরত মানুষকে আত্মোন্নতির সুযোগ দেয়, তেমনই সংসারও যেমন তাহাদের একেবারে মাটি হইয়া না যায়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে। ইসলামের এই বিধান সংসারকে ত্যাগ করিতে বলেনা, সংসারের সহিত মুখোমুখি সাক্ষাৎ করিয়া সংসারাতীতের সহিত যোগ স্থাপন করিতে বলে—সকল মানুষের সহিত একত্র ও একাত্ম হইয়া। ক্ষণিকের জন্য তোমাদের মিলন হইল, আপাততঃ সংসার তাহাতেই চলিবে, ইহার অধিক হইলে সংসার নষ্ট হইবে। তাই তাঁহার আহ্বান যেই শুনিলে, সাংসারিক বিষয়কর্ম ছাড়িয়া তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিবে; স্মরণ শেষ হইয়া গেলে আবার সংসারারণ্যে প্রবেশের জন্য ধাবিত হও—কৃতকার্য হইবে।'

অন্যধর্মাবলম্বী এবং অতি-আধুনিক-তথাকথিত মুসলমান ইসলামে যেখানে অতিরিক্ত কঠোরতা লক্ষ্য করেন এবং মানুষের দেহ ও আত্মা যেখানে অহেতুক পীড়িত হয় বলিয়া অভিযোগ করিয়া থাকেন, তাহা এই রোজা বা উপবাস ব্রতের মধ্যে। সেদিন কথোপকথনছলে আমার এক অমুসলিম বন্ধু বলিলেন: মনে করুন, আপনি চা পানে অতিরিক্ত অভ্যস্ত। সারাদিন চা না খেয়ে, কিম্বা এক আধটু ধূমপান না কোরে

কেমন কোরে কাটাবেন? আমি মনে মনে হাসিলাম। প্রকাশ্যে বলিলাম: কিন্তু তেমন কোন বিধান ত' নাই! ভদ্রলোক অপ্রতিভ হইয়া গেলেন।

বাহির হইতে রোজাকে যাঁহারা শুধু উপবাস ব্রত বলিয়া জানেন, তাঁহারা হাসিবেন, চা পানের কোন বিধান না থাকিলে অবশ্য অপ্রতিভ হইবেন সন্দেহ নাই: কিন্তু রোজার মাহাত্ম্য শুধু সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিছু না-খাওয়ার মধ্যে নয়। কঠিন পীড়ন, কৃচ্ছ্রসাধন ও নিয়ম-সংযমে মানুষের শরীর যেমন সুস্থ, সতেজ ও সবল হয়, তেমনি রোজার অতিরিক্ত শৃঙ্খলার জর্জরিত কষাঘাতে মানুষের আত্মা সুস্থ ও সবল হয়। পরমপুরুষের ঐশীশক্তিলাভে মানবাত্মা স্বতঃই উন্মুখ হইয়া উঠে। বৎসরের সুদীর্ঘ এগারমাসব্যাপী দেহমনের মধ্যে ষড়রিপুর তাড়নায় যে ক্লেদ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, বিষয় কর্মনিরত মানুষ দৈনন্দিন প্রার্থনা সত্ত্বেও যে চিত্ত-চাঞ্চল্যের, অশান্তির ও মোহমুগ্ধবৎ অবস্থার পরিচয় দিতেছিল, তাহারই দমন কল্পে ষড়রিপুর বিরুদ্ধে অভিযান এই রোজা। রজঃ ও সত্ত্বগুণের উপরে মনুষ্যহৃদয়ের তমোগুণের প্রাধান্য এত অধিক যে সুযোগ পাইলেই যে কোন অবস্থায় মানুষকে পথভ্রান্ত করিতে ইহা দ্বিধাবোধ করেনা। হৃদয়ের তমোগুণ বা 'নাফ্‌সে আম্মারা'কে করায়ত্ত করিয়া, কামক্রোধ লোভ-মোহ মদ ও মাৎসর্য প্রভৃতি অঘটনপটিয়সী ষড়রিপুকে বশীভূত করিয়া বৎসরের পরবর্তী এগারটি মাস শান্ত ও সংযতভাবে কাটানোর উদ্দেশ্যেই যেমন একদিকে দেহশক্তিকে হীন করার জন্য পেটের রোজা করা হইতেছে, অন্যদিকে তেমনই মুখের দ্বারা কাহাকেও কটু কথা না বলিয়া, পীড়িত না করিয়া মুখের রোজা করা হইতেছে। হাতদ্বারা কাহাকেও আঘাত না করিয়া, কাহারও অনিষ্ট না করিয়া, হাতের রোজা করা হইতেছে। চোখ তুলিয়া কোন কামিনী-কাঞ্চনের দিকে না তাকাইয়া, কোন আকর্ষণীয় বস্তুর দিকে না চাহিয়া চোখের ও মনের লোভ-তৃপ্তির রোজা করা

হইতেছে। জিহ্বার দ্বারায় তরল কিংবা শক্ত, সুস্বাদু কিংবা বিস্বাদ কিছু গ্রহণ না করিয়া জগতের স্বাদ হইতে নিজের জিহ্বাকে একটি দিনের জন্য বঞ্চিত রাখিয়া জিহ্বার রোজা করা হইতেছে ;—যেখানে কটূক্তি, পরনিন্দা, পরচর্চা হইতেছে, সেখান হইতে সরিয়া পড়, নহিলে তোমার কান তাহা শুনিবে, কানের রোজা হইবে না। রোজা রাখিয়া সুগন্ধি কিছু শুঁকিও না, হয়ত বা তাহাতে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিতে পারে। যেখানে মন্দ অনুষ্ঠিত হয়, মানুষ যাহার দ্বারা মন্দ করে, যেখানে আসক্তি ও আকর্ষণ রহিয়াছে, যেখানে মানুষ নিজের চিত্তকে দমন করিতে অসমর্থ,—সেখানেই মনুষ্য অঙ্গের প্রতি কণা-উপকণার রোজা, সেখানে সেই অঙ্গের উপবাস করাও, আপনি তাহা শান্ত হইবে। একদিকে যেমন বিভিন্ন নিয়ম শৃঙ্খলের দ্বারা মানুষের প্রতি অঙ্গের রোজা করা হইতেছে, অন্যদিকে তেমনই সারাটি মাস-ব্যাপী দিবারাত্র উপাসনা, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরাণ পাঠ, দানধ্যান, দরিদ্র ও মুসাফিরকে অন্নভোজন করাইয়া চিত্তের প্রসারতা বাড়াইয়া তোলা হইতেছে। যথার্থ মুসলিমের কাছে এই মাসের যে পবিত্রতা তাহা এই কারণে। এই জন্য রোজাকে উপবাস ব্রত বা উপোস করা বলিলে ভুল হইবে ; কারণ পবিত্র রমজান মাসের রোজা বলিতে মুসলমানের প্রাণে যেভাব ও অনুষ্ঠেয়কর্মাদি ভিড় করিয়া দাঁড়ায়, তাহা যিনি অমুসলমান তিনি কেমন করিয়া বুঝিবেন !

(প্রথমেই বলিয়াছি, আর্ট বা শিল্পের ক্ষেত্রে যেখানে যত সংযত নিয়ম শাসনে শিল্পের অবয়ব শিল্প অঙ্গ বা Symmetry গড়িয়া উঠিয়াছে, অথচ সেই বহির্বন্ধনই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া নাই, দেহের বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ছাড়াইয়া, আত্মার সৌন্দর্য ভাবলোকে অসীমের সন্ধানে ছুটিয়াছে, সেখানেই তাহা হইয়াছে, অতি উঁচুদরের শিল্প—'good and great art'।) পবিত্র রমজান মাসের মধ্যে ইসলাম ধর্মে নিয়মের যে কঠোর বাহির্বন্ধন দেখি, তাহাই যেন আমাদিগকে অতি সুন্দর, সূক্ষ্ম অথচ বৃহৎ শিল্পের কথা স্মরণ

করাইয়া দেয়। বাহিরের কি শৃঙ্খলা, কি শাসন, সেই শাসন একটু অমান্য করিয়াছ আর অমনি তোমার রোজা নষ্ট হইয়াছে, অথচ সেই শাসনের মধ্যে থাক, নিয়মের সেই কঠোর নিগড় পরিধান কর, দীর্ঘ একটি মাস তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন কর, দেখিবে তোমার আত্মা শুভ্র সংযত হইয়া অসীমের লীলানুরাগী হইয়া উঠিয়াছে; অসীম ও সসীম, মানবাত্মা ও পরমাত্মা একসূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে। সাংসারিক ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি প্লাবিতরস—নিষ্কাশিত আত্মার অসীমের সন্ধানে বাধাহীন এই অভিসারযাত্রাই রোজাকে যুগে যুগে ইসলাম ধর্ম-অঙ্গে বিরাট আর্টের মৌন গাম্ভীর্য ও সংহত সুষমা-দান করিয়াছে।

জীবনকে প্রধানতঃ বিভিন্নরূপে দেখিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন ধর্মে জীবনের কয়েকটি বিভাগ দেখিতে পাই। গার্হস্থ্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালন অপরিহার্য হইয়া উঠে। জীবনের ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য পর্যায় শেষ হইয়া গেলে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আসিয়া পর্যায়ক্রমে জীবনকে সংসার-বিমুখ করিয়া তোলে। ইসলামে জীবনধর্মের কোন পৃথক পর্যায় নাই। স্বীকার করি, হয়ত বা অধ্যয়ন পর্যায়ে ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য থাকিতে পারে। সে সামঞ্জস্য শুধু সেইখানেই। ইসলাম মানুষের সারাজীবনে রোজার মধ্য দিয়া ব্রহ্মচর্য বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস রমজান মাসের ভিতর দিয়া সংসারের পীঠভূমিতে মানুষের সারাজীবনে প্রতি বৎসরান্তে এমন এক অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থিরূপে বাঁধা পড়িয়াছে যে, তাহাই মুসলমানকে সংসারাসক্তি ও সংসার বিমুখতার, জ্ঞান ও কর্মের, যোগ ও ধর্মের আলোক দান করিতেছে।

দীর্ঘ ত্রিশদিন রোজা রাখার পর পশ্চিম গগনে ঈদের চাঁদ দেখা দিল, মুসলমানের প্রাণে আবার আনন্দ ফিরিয়া আসিল, মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল। আগামী কাল হইতে আবার এগার মাসের জন্য গতানুগতিক জীবনযাত্রা, আবার দিনের বেলায় অবাধ পানাহার, রসনার কারামুক্তি,

হাসি ত আসিবেই। তাই অধরোষ্ঠের প্রান্তভাগে ক্ষীণরশ্মি রেখা। মনে হইল যেন সারা বিশ্বে মুসলিম প্রাণে আনন্দের আতিশয্যে ভীষণ কোলাহল তুলিবে, প্রাণানন্দের মাতামাতিতে কলরোল উঠিবে।

কিন্তু পরদিন প্রাতে মুসলিম-জাহানে একি অপরূপ রূপ দেখিতেছি? প্রাতে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া পবিত্র বসনভূষণে আবৃত হইয়া সুগন্ধি ছড়াইতে ছড়াইতে আবালবৃদ্ধবনিতা মানবাত্মার একি অপূর্ব ভাবসমাগম! পৃথিবীর সকল স্থানে চাহিয়া দেখ, যেখানে মুসলমান আছে, সেখানেই তাহাদের এই অসংখ্য সমাবেশ। সেই সম্মিলনে বিশ্বব্যাপী আনন্দের বাদ্যধ্বনি বাজিতেছে না, আনন্দের বহির্বিকাশে 'প্রাণেতে মাদলে' হট্ট-গোলও হইতেছেনা—সে আনন্দে, অতিরিক্ত উল্লাস লাস্য নাই, তাণ্ডব নৃত্য নাই, বাহ্যিক চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের ঔজ্জ্বল্য তাহা চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে না। এই আনন্দে অসীম ও সসীম প্রাণে প্রাণে আপনাকে আপনিই উপ-ভোগ করিতেছে। শত শত মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ আহ্বানে তাহার রাজ্য কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। পরমাত্মাও আজ তাহার প্রিয়জনের প্রার্থনা গ্রহণ করিতে আসিয়া বিশ্বজনে ডাক ছাড়িয়া বলিতেছেন—'ওঠো, জাগো, দেখো, হট্টগোল না করিয়া উল্লাস না ছড়াইয়া, কেমন করিয়া আত্মানন্দ প্রার্থনা ও উপাসনার মধ্য দিয়া প্রকাশ করা যায়—আত্মানন্দ ভূমানন্দে লীন করা যায়।' পবিত্র ঈদ জগৎসমক্ষে সেই আদর্শ প্রচার করিতেছে।

ইসলামের প্রত্যেক পার্বণ-পর্বে আমরা যে সৌন্দর্য, যে শৃঙ্খলা, শোভা, যে ঔজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করি, তাহা বাহ্যিক নিয়ম শৃঙ্খলকে অতিক্রম করিয়া তাহার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যকে এমনি শান্তভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে। সে আনন্দ ও সৌন্দর্য বাহিরের নহে, তাহা ভিতরের, বাহির হইতে দেখিতে গেলে সেখানে বিশাল-নৈপুণ্য ও সহজ আনন্দের তরলোচ্ছল বহির্বিকাশ পাওয়া যাইবেনা বলিয়া তাহাকে ছোট করিয়া দেখা হইবে। ইসলামকে জানিতে হইলে, তাহার প্রত্যেক পর্বের সেই আভ্যন্তরীণ প্রশান্তজ্যোতি ও স্থির মৌন গাম্ভীর্যের ভিতর দিয়াই তাহাকে জানিতে হইবে।

দেশের কথা,
ঈদসংখ্যা, অক্টোবর ১৯৪৩।

মুসলিম ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা

জগতের প্রত্যেক দেশের উন্নতি ও অবনতি, উত্থান ও পতন সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপরেই নির্ভর করে। দেশের যাবতীয় দুর্গতির মূলে থাকে শিক্ষার অব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত শিক্ষার অভাব। বৃটিশ আমলে ভারতবর্ষ শিক্ষার দিক দিয়া উন্নতি সাধন করিয়াছে কিনা তাহা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা শক্ত। ইংরাজ রাজত্বের অবসানে ভাবীকালের ঐতিহাসিকেরা এবং শিক্ষাবিদেরা তাহার বিচার করিবেন। আধুনিক কালে গণ-শিক্ষার কথা না-ই বা বলিলাম কিন্তু যে শিক্ষা ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা এ-দেশের পক্ষে কতটা কালোপযোগী ও কার্যকরী সে বিষয়ে যথার্থ শিক্ষা-বিদদের যথেষ্ট সংশয় রহিয়াছে। অন্যান্য স্বাধীন দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ শিক্ষার দিক দিয়া অনেক পশ্চাৎপদ: এমনকি এখনও অন্ধতার সীমারেখা এড়াইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের এই দুরবস্থা কে করিল? স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, দেশের শাসনভার যাঁহাদের হাতে ছিল তাঁহারা কি ইচ্ছার প্রতিকার ও সত্যকার সুব্যবস্থা করিতে পারিতেন না?

প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে (এখানে স্বাধীন দেশই বুঝিতে হইবে) নির্দিষ্ট একটা আদর্শ বা লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায় স্বরূপে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে কোন দেশ একটা স্বাধীন দুঃসাহসী জাতি তৈরী করিবার জন্য, কোনদেশ বা তাহার অধিবাসীদিগকে দেশভক্ত করিয়া তুলিবার জন্য তদুপযোগী শিক্ষাপদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, ফ্রান্স ও জার্মানীর কথা ধরা যাইতে পারে। ফ্রান্সে 'রিপাব্লিক্যান গবর্ণমেণ্ট' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাহারা তাহাদের স্বজাতিবৃন্দকে স্বাধীন বলিষ্ঠ মানুষ গড়িবার আশায় তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতিকেও 'স্বাধীনতা ও সাম্যমৈত্রীর'

ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করিয়াছিল। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ানের হাতে জার্মানীর পরাজয়ের পর জাতীয়জীবনের প্রয়োজনানুসারে জার্মাণী তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। অসাধারণ দেশপ্রীতি এবং তাহাদের পিতৃভূমির প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগই তাহাদের শিক্ষা-পদ্ধতির পুনর্গঠনে তদনুরূপ ইন্ধন যোগাইয়াছিল। সুতরাং প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন ও যুগোপযোগী প্রয়োজনানুসারে তাহার পুনর্গঠন ছাড়া জাতীয় জীবনের উন্নতি কল্পনাতীত, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

এখানকার কথা না হয় বাদই দিলাম। (প্রাচীন ভারতবর্ষ এমনকি মধ্যযুগের মুসলিম ভারতও ধর্মপ্রবণ ছিল। তাই দেখা যায় মুসলিম ভারতের শিক্ষা-প্রণালীও মূলতঃ ধর্মীয় ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছিল। শিক্ষানুশীলনকারী ছাত্রদের মানসিক বৃদ্ধি ও শারীরিক শক্তি যাহাতে সংযত হয় এবং চরিত্র গঠনের দ্বারা নৈতিক ও আর্থিক জীবনের যাহাতে উন্নতি হয় মুসলিম ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে সেই দৃষ্টিই সক্রিয় ছিল। ইসলামের আদর্শের সঙ্গে মুসলিম ভারতের শিক্ষা-প্রণালীরও যথেষ্ট সামঞ্জস্য ছিল। ইসলাম সংসারকে বাদ দিয়া শুধু মাত্র আধ্যাত্মিকতা ও সংসারাতীতের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকা কোনদিনই সমর্থন করে না। দীন ও দুনিয়া যাহাতে বজায় থাকে কোর্‌আনে সুরা 'জুমআর' মধ্যে তাহার পরিষ্কার নির্দেশ আছে। জুমআর দিনে নামাজের উদাত্ত আহ্বানে সংসারকে ভুলিয়া সংসারাতীতের সন্ধানে সাড়া দাও; তাঁহার সঙ্গে একাত্মতার পরে বিধিবদ্ধ জীবিকা উপার্জনের জন্য দুনিয়ার বিস্তৃত বুকে আবার ছড়াইয়া পড়ো। আধ্যাত্মবাদের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের এমন সুসামঞ্জস্য, এমন নিয়মবদ্ধ প্রণালী আর কোন ধর্মে আছে কিনা জানি না। ইসলামের এই ভিত্তির উপরেই মুসলিম জগতের উন্নতির দিনে তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরাট সৌধ নির্মিত হইয়াছিল। তাই আমরা ইসলামের বিদ্যাদীপ্তি ও ব্যাপ্তির দিনে একাধারে অসংখ্য যোগী ও গৃহী, দরবেশ ও বাস্তব মানুষ, নৈয়ায়িক ও পণ্ডিত, বৈজ্ঞা-

নক ও ঈসাবী, দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী পাইয়াছি। ভারতবর্ষে মুসলিম শক্তি যখন প্রবেশ করে এবং স্থায়ী আসন লাভ করে তখন ইউরোপ ও মধ্য এসিয়ার ইসলামের বিপ্লবাত্মক ও বিস্ময়কর শক্তির প্রবাহ মন্থর হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু তখনও ব্রহ্মণ্যশক্তি প্রপীড়িত ভারতবাসীদের কাছে ইসলামের ব্যবহারিক জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ অম্লান দীপালোকের মত প্রদীপ্ত ও ভাস্বর ছিল। ইসলামের সেই উজ্জ্বল আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রথমদিকে দিল্লীর সুলতানেরা কি পরের দিকের মোগল সম্রাটেরা উক্ত পদ্ধতিতেই নিজেদের পরিবারের এবং দেশের জনসাধারণের শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ ও ভাঙাগড়ার দিনে মাঝে মাঝে সমগ্র ভারতবর্ষ বিকম্পিত হওয়ার সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থাও হয়ত ভাঙন ধরিয়াছে, কিন্তু সেই বিপুল ঘূর্ণিবাত্যার ভারতব্যাপী আলোড়নের মন্থিত গরল স্নিগ্ধ-শীতল হওয়ার পূর্বেই বিজয়ী রাজা বা সম্রাট আলোড়িত ভারতবর্ষের উপরিভাগে তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ ও প্রজা-মন গঠন করিবার জন্য আদর্শোজ্জ্বল শিক্ষার ধারা প্রবর্তিত করিয়াছেন। দিল্লীর সুলতানদের, প্রাদেশিক মুসলিম শাসনকর্তাদের এবং মোগল-ভারতাধীপের ইতিহাস আমাদের এই উক্তির যাথার্থ প্রমাণ করিবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, মুসলিম ভারতের শিক্ষার প্রথম সোপান ছিল ধর্ম, কিন্তু ধর্মই একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ফারসীর মধ্যস্থতার শিক্ষা পাইত কিন্তু মুসলমানদের জন্য কোরআনের ভাষা আরবী ছিল অবশ্যপাঠ্য। শিক্ষার তিনটী স্তর ছিল। উচ্চ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক। উক্ত তিন প্রকারের শিক্ষাই মক্তব্ মাদ্রাসা, স্কুল কলেজ, মসজিদ ও খানকা এবং কোন কোন স্থলে ব্যক্তিগত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যদিয়া দেওয়া হইত। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে অক্ষর পরিচয় ও ছোট খাটো পুস্তক পড়িতে পারা এবং খোদাতায়ালার প্রশংসাসূচক ছোট কবিতাদি হৃদয়ঙ্গম ও মুখস্থ করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। অল্প সময়ের মধ্যে বহুদূর অগ্রসর হইতে

পারাই ছিল প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সম্রাট আকবরের সময় তাঁহার স্বকীয় যত্ন ও চেষ্টার ফলে এই প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত ও চরমোন্নতি হইয়াছিল। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া ছাত্রেরা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য উপযুক্ত বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিত। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্য তালিকা ছিল এইরূপ :—নীতিশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, জ্যোতি-বিদ্যা, শাসনতন্ত্র, গণিত, বীজ, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার আইন, সামাজিক ও ধর্মানুশাসন জমিজমা সংক্রান্ত হিসাব নিকাশ, কৃষিবিদ্যা অর্থনীতি এবং ইতিহাস।

হিন্দুদের জন্য তাহাদের জাতীয় জীবন ও বিবিধ সংস্কৃতি সংক্রান্ত, পুস্তকাদি পাঠ্যতালিকা ভুক্ত ছিল। মুসলিম ভারতের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মক্তব মাদ্রাসায় উপরিউক্ত বর্ণিত বিষয়গুলির সবটিই অবশ্য পাঠ্য ছিল না; কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশগুলিতেই উক্ত বিষয়গুলির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত। কোন বিশেষ বিষয় অধ্যয়নে কাহাকেও বাধ্য করা হইত না, ছাত্রদের আপন রুচির উপরেই বিষয়ের পছন্দাপছন্দের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইত। নিজেদের জীবনের ভবিষ্যৎ আশা আকাঙ্খার পূরক হিসাবেই ছাত্রেরা বিষয় নির্বাচন করিত। কিন্তু যুগোপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনানুসারে যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা অপরিহার্য ছিল, সেখানে কাহাকেও শৈথিল্য প্রকাশ করিতে দেওয়া হইত না। গরীব ছাত্রেরা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিনা খরচায় লেখাপড়া শিখিতে পারিত এবং সরকারী বেসরকারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মধ্যে দেখা যায়, হিন্দু ভারতে একমাত্র শাসক সম্রাটদের সন্তানদের ছাড়া আর কাহাকেও শাসনতন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হইত না কিন্তু মুসলিম ভারতে রাজা ও প্রজার সন্তান নির্বিশেষে শাসনতন্ত্রে শিক্ষা পাইত। ইহা যেমন একদিকে মুসলিম সম্রাটদের ব্যক্তিগত উদারতার

পরিচয় বহন করে, অন্যদিকে তেমনি দেশের জনসাধারণের শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে পরিস্ফুট ধারণা ছিল, এমনই আশ্বাস জাগাইয়া তোলে।

বর্তমান কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলিতে যেমন আকস্মিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্দ্ধবাৎসরিক ও বাৎসরিক প্রভৃতি নানাবিধ পরীক্ষার প্রচলন রহিয়াছে, মুসলিম ভারতের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে তেমন পরীক্ষা-ভীতির দ্বারা অসময়ে ছাত্রদের 'আত্মারাম' শুকাইয়া দেওয়ার অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল না। অধিকন্তু বর্তমান কালের মত অতিরিক্ত ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা প্রীতি ও সেযুগে ছিল না। নির্দ্দিষ্ট কতগুলি পরীক্ষা পাশের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ও নির্দ্ধারিত হইত না। বর্তমান কালে যেমন একজন পড়ান, অন্য একজন প্রশ্ন করেন এবং তৃতীয় ব্যক্তি যেমন ছাত্রদের প্রশ্নপত্রের উত্তর দেখার প্রহসন করেন সে-যুগে তেমন ছিল না। ছাত্র পরবর্তী উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে কিনা যিনি শিক্ষা দিতেন সেই শিক্ষক নিজেই তাহার পরীক্ষা লইতেন। পরীক্ষাশেষে ছাত্রদের সনদ বা সার্টিফিকেট ছাড়া, বৃত্তি ও পুরস্কারস্বরূপ পদক ইত্যাদিও দেওয়া হইত। ফলকথা, তখনকার পরীক্ষাপদ্ধতি ছিল সহজ, আড়ম্বরহীন, কিন্তু অধিকতর ফলপ্রদ।

নিয়মিত স্কুল কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে শিক্ষা বিস্তারের সুবিধা ত ছিলই, অধিকন্তু শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য (বর্তমানে যাহা দুষ্প্রাপ্য) অনেক স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত। সেখানে কেতাবী বা পুঁথিগত বিদ্যায় যাঁহারা পারদর্শী তাঁহারা তাঁহাদের পাণ্ডুলিপি পুঁথি লইয়া উপস্থিত হইতেন, বহুদর্শনজাত অভিজ্ঞ ও জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিরাও সেখানে হাজির থাকিতেন এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিরাও সময় ও সুযোগ বুঝিয়া সেখানে আসিয়া জুটিতেন। শিক্ষিতেরা উচ্চস্বরে গ্রন্থাদি পড়িতেন এবং জটিল স্থানগুলির ব্যাখ্যা করিতেন। কেতাবী বিদ্যায় অজ্ঞ অথচ ভূয়োদর্শনজাত অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহাদের সঙ্গে বিবিধ বিষয় লইয়া তর্ক ও

আলোচনা করিতেন। সেই আলোচনায় শিক্ষিত অশিক্ষিত উপস্থিত সকলেই লাভবান হইতেন; তাঁহাদের অভিজ্ঞতা পুষ্ট হইত; জ্ঞান বৃদ্ধি পাইত এবং সকলেই আত্মপ্রসন্নতা লাভ করিতেন। এরূপ অধিবেশন অধিকাংশক্ষেত্রেই বিভিন্ন সাহিত্য সঙ্ঘের মধ্য দিয়া অনুষ্ঠিত হইত। সাহিত্য সঙ্ঘগুলি রাজপরিবারের লোকদের দ্বারা এবং অধিকাংশ স্থলে সৌখীন ও সাহিত্যানুরাগী যুবরাজদের দ্বারাই গঠিত হইত। উদাহরণ স্বরূপ সম্রাট গিয়াসউদ্দীন বলবনের পুত্র যুবরাজ মহম্মদের সাহিত্য ও দর্শন প্রীতি এবং তদজনিত সাহিত্য সঙ্ঘ গঠনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সৌখীনএবং সাহিত্যানুরাগী যুবরাজের প্রাসাদেই সাহিত্যামোদীদের সভা বসিত। সেকালের শ্রেষ্ঠ কবি আমির খসরু সভাপতিরূপে তাঁহার সাহিত্য-সভা অলঙ্কৃত করিতেন। এতদ্ব্যতিরেকে পাঠান ও মোগল আমলের বহু সাহিত্যানুরাগী সম্রাট ও যুবরাজের নাম করা যাইতে পারে যাহারা শুধু নিজেরাই জ্ঞানরাজ্যের অতলে প্রবেশ করিয়া অমৃত আহরণ করেন নাই, অধিকন্তু বহুলোককে সাহিত্যামোদী করিয়া তুলিয়াছেন এবং সাহিত্য-সভার আসর জাঁকাইয়া জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্যপ্রীতি, শিক্ষানুরাগ এবং শিক্ষা সাধনার লালন-পালন করিয়া অমৃত রসলোকের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন। রাজা ও রাজ পরিবারের শিক্ষা সাধনা ও আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগই দেশকে সামরিক ও বিপুল ঝঞ্ঝাবাত্যার মধ্যেও একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোকোদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। মোহাম্মদ তোগলক্‌, ফিরোজ শাহ্‌, গিয়াসউদ্দীন (২য়) হুসেন শাহ্‌, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, দারা শেকো, জাহানারা, আওরঙজেব এবং জেব-উন্নিসা মুসলিম ভারতের শিক্ষা-সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে ন্যূনপক্ষে তাঁহাদের নাম ও স্মৃতি শিক্ষা-দরদী মানুষকেই অশ্রুসজল করিয়া তোলে। তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে আশা ও আনন্দ, ভোগ ও ত্যাগ, সাধনা ও সংগ্রাম, দুঃখ ও মৃত্যুর কথা না-ই-বা বলিলাম!

উপরিউক্ত এবং আরও অনেক রাজা ও রাজপুত্রেরা সমগ্র মুসলিম শাসনকাল ধরিয়া ভারতবর্ষের কত কবি ও সাহিত্যিকের, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই! এক একজন সম্রাটের দরবারে কত কত স্থানের কাব্যামোদীদের আমন্ত্রন হইত। রাজানুগ্রহ লাভ করিবার জন্য বুদ্ধি ও রসজীবীদের মধ্যে কত রকমের উত্তেজনার সৃষ্টি হইত। সভাগৃহ কবিদের কবিতা-আবৃত্তি-জনিত কলগুঞ্জনে মুখরিত হইয়া উঠিত। গুনীদের যথোপযুক্ত সমাদর হইত, কেহবা আশাতিরিক্ত পুরস্কৃত হইতেন। কেহবা আশানুরূপ, কিন্তু কেহই রাজ-দরবার হইতে বিষণ্ণ হইয়া ফিরিতেন না। এমনি ভাবেই মুসলিম শাসন-কালে ভারতবর্ষে বহু বজ্র কঠোর ও কুসুম কোমল রস-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এবং রাজানুগ্রহ ও প্রসাদ লাভ করিবার জন্য শুধু শিক্ষা ব্যবস্থাই নয়, সাধারণের মধ্যেও শিক্ষার চর্চা রীতিমত দীপ্তি পাইয়াছে।

বর্তমান যুগের শিক্ষাপদ্ধতির সহিত তুলনায় মুসলমান আমলের শিক্ষা পদ্ধতি নিকৃষ্ট এবং অসম্পূর্ণ ছিল, অনেকে এমন মত পোষণ করেন। অধুনা আমরা যে শিক্ষা পাইতেছি ও দিতেছি তাহা বিগত পঞ্চাশ বৎসরেই এরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে কিন্তু তবুও দেশকাল ও যুগোপযোগী নহে। সত্য-বটে, আমরা বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতার আলোকে এবং বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের মারমুখো ভয়াবহতার মাঝখানে বাস করিয়া অনেক কিছু দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি—পড়িতেছি এবং পাইব ও সেই আলোকে এবং আণবিক শক্তি ও বোমা-ঘটিত লোমহর্ষক সংবাদে মুহুর্মুহু আমাদের চক্ষুস্থির ও হৃতপিণ্ড সঙ্কুচিত ও কম্পিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের এই পোড়াদেশে জনকয়েক ধনী সন্তান ও ভাগ্যবানছাড়া এপর্যন্ত যাহারা নিজেদের সর্বস্বান্ত করিয়া শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইল তাহারা কেরাণী ছাড়া আর হইল কি! মুসলমান আমলে এমন জাঁকালো বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ত ছিলনা, অল্প খরচে এমনকি বিনা খরচে লোকেরা এবং তাহাদের সন্তান-

সন্তান লেখাপড়া শিখিতে পারিত। এখনকার মত শিক্ষার নামে সরকারী চাকুরীর আশায় উপাধি মুখে করিয়া শিক্ষায়তন হইতে হয়ত বাহির হইত না, কিন্তু যেটুকু লেখাপড়া শিখিত, তাহাতে তাহাদের জীবনে সর্ববিধ উপকার ও প্রয়োজন সাধিত হইত। দেশ ও কালের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তাহা শিক্ষার্থীদিগকে শিখিতেই হইত। এমন পরীক্ষাও ছিল না এবং পরীক্ষা পাশের জন্য ব্যাঙের ছাতার মত নানা রকমের 'নোট', 'ডাইজেষ্ট', 'Sure success' ও ছিল না. সেইজন্য শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় অনুশাসনে নৈতিক, মানসিক সাংসারিক, আর্থিক ও ব্যবহারিক যাবতীয় উন্নতির জন্য অনুরূপ পাঠ্য তালিকা ও পঠন পাঠনের বিধান নির্দ্ধারিত ছিল।

শিক্ষার বহুল প্রচলন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিলেই শত সহস্র শিক্ষার্থীর মধ্য হইতে বহু পণ্ডিত, জ্ঞানী ও গুণীর, অভ্যুদয় হইয়া থাকে। মুসলমান আমলে ধর্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে দেশোপযোগী সাংসারিক সকল প্রকার জ্ঞান-সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হইয়াছিল বলিয়াই তোডরমলের মত অর্থ সচিব, আবুল ফজল ও ফৈজীর মত জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক, আলবেরুনীর মত বৈজ্ঞানিক ও বহু ভাষাবিদ এবং তানসেনের মত সুরজ্ঞ ও সঙ্গীতবিদের অভ্যুদয় সম্ভবপর হইয়াছিল। জ্ঞানবিজ্ঞানে ধর্মীয় অনুশাসন ও বুদ্ধিবৃত্তিতে পরিপুষ্ট সাধারণ শিক্ষার্থীদের উল্লেখ নাই-বা করা গেল।

(মুসলিম ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং স্থায়ী ফল ফলিয়াছিল ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐক্য সংঘটনে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরাই একই সরকারী ও বেসরকারী স্কুলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষালাভ করিত। সম্প্রদায় নির্বিশেষে ফারসী ছিল অবশ্য পাঠ্য। হিন্দুরাও অনেকে আরবী পড়িতেন, ফারসী ও আরবীতে সাহিত্য চর্চা করিতেন। সংস্কৃত ও হিন্দির চর্চা হইত। অনেক মুসলমান সংস্কৃত ও হিন্দিতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং উক্ত ভাষায় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, অথর্ববেদ ও ভগবত-গীতা এবং

রাজতরঙ্গিনী প্রভৃতি অনেক গ্রন্থই ফারসীতে অনূদিত হইয়াছিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতিগত ভাব ও বৈশিষ্ট্যের আদান প্রদান হইত। পরস্পর পরস্পরকে জানিত। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই হৃদ্যতার সদ্ভাব বর্তমান ছিল। পারস্পারিক ভাবের আদান প্রদান এবং পরস্পরের সহযোগিতায় উর্দূ ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল।

ধর্ম ও আচারগত পার্থক্য থাকিলেও উভয় সম্প্রদায়ের এক ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্যের আয়োজনানুষ্ঠানের জন্যই সে যুগে ভারতের এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে, সম্প্রীতি, মৈত্রী ও সৌহার্দ্য বজায় ছিল। মুসলিম ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে যদি কোন আদর্শ বা লক্ষ্য পৌছিবার উদ্দেশ্য থাকিয়া থাকে তাহা জাতীয় ঐক্য এবং জাতিগঠনের ভিত্তিতেই অনুসৃত হইয়াছিল। সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থার ইহাই ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু আজ? মুসলমানদের রাজ্য গেল। পলাশীর যুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রের অবসান ও ইংরাজ-রাজ সরকারের অভ্যুত্থান হইল। পরাজিত মুসলমানেরা বিজয়ী রাজশক্তির নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইল না। অধিকন্তু সংশয় ও সন্দেহের চোখে বৃটিশ রাজশক্তি তাহাদিগকে দেখিল। সরকারী চাকুরী হইতে তাহারা অপসৃত হইল। তদুপরি ১৭৬৫ হইতে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত একশালা, পাঁচশালা, দশশালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, তাহার পর সূর্যাস্ত আইন এবং ওয়াকফ সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি বা রিজাম্পসন্ আইন প্রভৃতি নানাপ্রকার রাজস্ব আইন দ্বারা অর্থবান শ্রেণী বিলুপ্ত হইল। একের প্রতি নিগ্রহ এবং অন্যের প্রতি আগ্রহের জন্য মুসলমান অর্থবান শ্রেণীর স্থানে হিন্দু ভূস্বামী ও জমিদারদের আবির্ভাব হইল। সরকারী সহযোগিতায় নবোত্থিত হিন্দু শক্তির প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা এবং মুসলমানদের প্রতি সরকারী অবজ্ঞার জন্য ধীরে ধীরে মুসলিম সংস্কৃতি ও শিক্ষা অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতে মুসলমানদের মধ্যে নবীন আশার সঞ্চার হইল

ও নূতন চেতনা দেখা দিল, তখন দেখা গেল পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় ও আর্থিক উন্নতিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। তখন তাহাদের মনে জাগিয়াছে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা। এহেন অবস্থায় মুসলিম ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে যে সম্প্রীতি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান ছিল তাহা আর দেখা গেল না। তখন হইতেই দেখা গেল পরস্পরের মধ্যে একটা সন্দেহ এবং অবিশ্বাস। সেই অবিশ্বাস ক্রমে দৃঢ় হইল। মুসলমান আমলের শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য সংস্কৃতিগত যে মিল ও ঐক্য সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা আর পাওয়া গেল না। সেখানে আসিল বিরোধ এবং বিদ্বেষ, হিংসা ও অসূয়া। আজিকার এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ শেষ করিতে গিয়া অতীতের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া ধরিলে স্বতঃই প্রশ্ন মনে আসে হিন্দু মুসলমানের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিগত ঐক্যের এই শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী কে?

সাপ্তাহিক মোহাম্মদী,
বিশেষ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৩।

মুসলিম ভারতে স্ত্রীশিক্ষা

স্ত্রী পুরুষের শুধু অর্দ্ধাঙ্গিনী নন, স্ত্রী-পুরুষ অধ্যুষিত বৃহত্তর সমাজের অর্দ্ধাঙ্গও বটেন। একথা এত সত্য এবং এত মীমাংসিত যে, তা এমনভাবে অকপটে বলা নিরাপদ নয়, কারণ যিনি এমনভাবে বলতে যান সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গীর লোক বলে' প্রগতিবাদীদের কাছ থেকে নিন্দাও পেতে হয়। প্রগতিবাদ বা গতিবাদ যা-ই বলি না কেন তার আওতায় পড়ে আমরা—নাড়ী-পুরুষেরা এগিয়ে চলেছি দ্রুত পদক্ষেপে,—কোথায় তা অবশ্য সকলের ঠিক জানা নেই কিন্তু পরিবর্তনের মধ্যে সেটুকু জানা না থাকলেও বোঝে অনেকেই। এই পরিবর্তনের তালে পা ফেলে চলতে গিয়ে একদিন পুরুষের সার্ট-পাঞ্জাবীর ঝুল হাঁটু থেকে কোমরে উঠেছিল আবার কোমর থেকে হাঁটুর উপরে নেমে এসেছে; আর নারীর পোষাক পরিচ্ছদের মাপ ও কেতা বিগতখ্যাতি ফিল্ম তারকার ভঙ্গী ছেড়ে হালের খ্যাতনামা তারকার পেছনে ছুটতে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনমুখো গতিবাদের ভেতরে পড়ে' নারী সাংসারিক কর্মক্ষেত্রে পুরুষের শুধু অর্দ্ধাঙ্গিনী হিসেবেই নেই, অনেক স্থলে পূর্ণাঙ্গ হোয়ে উঠেছেন। এতটা অগ্রগতি ভালো কি মন্দ সেকথা বলছি না। আসল কথা—আজকের দিনে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী তাঁরা হোন বা না হোন সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ তাঁরা নিশ্চয়ই। মুসলিম ভারতে সমাজের সেই অর্দ্ধাঙ্গের শিক্ষার কি প্রকারের ব্যবস্থা ছিল তাই বলবো।

শিক্ষা-ব্যতিরেকে মানুষের কল্যাণ নেই, অন্ধকার থেকে মুক্তিও নেই, স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণ করা ত দূরের কথা তা পাওয়ার অধিকারও তার নেই! ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি এবং দিচ্ছি তা কোনদিনই সমষ্টিকে পূর্ণ মানুষ করে তোলেনি এবং এ শিক্ষা যদি এমনিভাবেই এদেশের লোককে দেওয়া হোতে থাকে তাহোলে কোনদিনই

তা বহুর কল্যাণে আসবে না। যে স্বল্পসংখ্যক ধনী ও মধ্যবিত্ত সন্তান এ শিক্ষা পেলো তার কয়জনই বা সত্যকার জ্ঞানপুষ্ট মানুষ হোতে পারলো? এত বছরের শিক্ষার যে প্রবহমান ধারায় দেশের তথাকথিত শিক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষগুলোই মানুষ হোতে পারলো না, সেই শিক্ষাই যদি স্ত্রীজাতিকে দেওয়া হয় তাদের কোন কল্যাণে আসবে? তবু তাঁদের যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা যতদিন না হচ্ছে ততদিন যদি তাঁরা প্রচলিত শিক্ষালাভ থেকে একেবারেই বঞ্চিত থাকেন তবে এ জাতির অন্ধকার অমানিশার ঘোর কোনদিনই কাটবে না। বাঙলাদেশে এ পর্যন্ত শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যাই বা ক'জন? সে পরিমাণে শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা আরও নগণ্য। অবশ্য কলকাতা সহরে বা অন্যান্য মফঃস্বল সহরে আমরা যে কতগুলি আধুনিকাকে চলাফেরা করতে দেখি, তাঁদের দেখে আনন্দ হয় বটে কিন্তু জাতি-গঠনের কথা ভাবলে তাঁদের সংখ্যার স্বল্পতার দিকে চেয়ে আর ভরসা হয় না। বাঙলা-দেশের সভ্যতা গ্রামনির্ভর। অথচ গ্রামের হাজারকরা একটি রমণীও অন্ততঃ আজকের শিক্ষাতেও শিক্ষিতা নন। এ প্রশ্ন আজকের দিনের ভাবুক ও চিন্তা-শীলদের ভাবিয়ে তুলেছে। তাই তাঁদের জন্য সংখ্যায় অল্প হোলেও বালিকা বিদ্যালয় হচ্ছে, স্কুল কলেজও হচ্ছে। আজকের দিনে মেয়েরা লেখাপড়া শিখবেন কিনা এটা প্রশ্নই নয়, প্রশ্ন হচ্ছে কি কোরে তাঁদের সুযোগ দেওয়া যায় এবং কেমন কোরে বর্তমান শিক্ষাকে তাঁদের শারীরিক, মানসিক ও সাংসারিক বহুবিধ কল্যাণের উপযোগী করা যায়।

আজকের দিনে তাঁদের স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হোয়েছে তাই এখন নারীকে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী বল্লে এমন কথায় সেকেলে গন্ধ বেরোয়, কিন্তু এমন এক-দিন ছিল যেদিন নারীকে সমাজের অর্দ্ধেক বলা ত দূরের কথা পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনীও অনেক দেশে বলতে চেতো না। (নারী ছিলেন ভোগের পাত্রী, হাত পা ও বিশেষ অবয়ব-বিশিষ্টা উষ্ণ মাংসপিণ্ড ছাড়া তাঁদের আর কিছু বলা হোত না। তাঁদের আত্মা আছে কিনা এতেই আধুনিক অতি সভ্য

ইউরোপ একদিন সন্দেহ কোরেছে। (সেই অন্ধকার যুগে ইসলাম জগতের বুকে নারীকে প্রতিষ্ঠা দিল, সম্মান দিল, অধিকার দিল।) অন্ধকার যুগের কারাপ্রাচীর ভেঙে তাদের জন্য আলোর দেশের বার্তা বয়ে নিয়ে এলো। কোরআনে বলা হলো 'তারা (মেয়েরা) তোমাদের পরিচ্ছদ স্বরূপ, এবং তোমরাও (পুরুষেরা) তাদের পরিচ্ছদ স্বরূপ, অর্থাৎ সামাজিক দাবীতে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে সম্মান ও আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, সেখানে স্ত্রীকে ভোগের পাত্রীরূপে ব্যবহার করলে চলবে না।

কাউকে মর্যাদা বা সম্মান শুধু দিলেই চলে না, সেই সম্মানের যোগ্য যেন সে হোতে পারে তার বিধি ব্যবস্থাও করা চাই। সেজন্যে কোরআনের নির্দেশক্রমে হযরত মোহাম্মদ প্রচার করলেন 'প্রত্যেক নরনারীর জন্য বিদ্যাশিক্ষা অবশ্যকর্তব্য এবং বিদ্যালাভ করতে যদি সুদূর চীনদেশে যেতে হয় তবুও তা স্বীকার্য। হযরতের যুগে শিক্ষালাভের জন্য সম্ভবতঃ কোন মহিলাকে চীনদেশে যেতে হয়নি, তবু তাঁর যুগেই ব্যবহারিক ও ধর্মীয় জীবনের উপযোগী আদর্শশিক্ষা বহু মহিলাই পেয়েছিলেন। মুসলিম সভ্যতার সেই শৈশবে হযরতের কন্যা ফাতেমা, স্ত্রী আয়েষা এবং অন্যান্য রমণীরা যেমন জয়নাব, হামদা, হাফসা, সাকিরা ও মারিয়া প্রভৃতি রীতিমত মার্জিত শিক্ষাই পেয়েছিলেন। অন্ধকার যুগ কেটে যাবার সময়ে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে সে যুগে যে কয়জন মহিলা শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত ফাতেমাই ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরতের মৃত্যুর পর খলিফা কে হবেন এমন কঠিন প্রশ্নের সমাধানকল্পে তাঁকেও অংশ গ্রহণ করতে দেখা গেছে।

ইসলাম ভারতে এসেছিল তার বিস্ময়কর বিপ্লবের প্রভাব অনেকটা মন্থর হোয়ে এলে। শিক্ষায় ও সাহিত্য সাধনায় ভারতের বাহিরে মুসলিম মহিলারা যে স্তরে পৌছেছিলেন ভারতীয় মুসলিম মহিলাদের সে স্তরে পৌছার সৌভাগ্য হয়নি, তবু তাঁরা যে শিক্ষা একেবারে পাননি একথা বলা

ঠিক হবে না। আজকালের তুলনায় মুসলিম আমলে স্ত্রী-শিক্ষার এত প্রচলন ছিল না, অবশ্য বর্তমান যুগে মেয়ের বা তাঁদের অধিকাংশ অভি-ভাবকেরা শিক্ষাকে যে জীবনের অপরিহার্য অংশ বলে' মনে করেন তা নয়, মেয়েদের শিক্ষা অনেকের কাছে এখনও আমাদের দেশে ফ্যাশান বা সৌখি-নতার অঙ্গ হিসেবে রয়ে গেল কতকটা যথোপযুক্ত শিক্ষার অভাবে এবং অনেকটা বর্তমান স্ত্রী-শিক্ষার পদ্ধতির দোষে। (তবু সেই মধ্যযুগে এই ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রশাসিত ভারতবর্ষে যখন বৈশ্য-শূদ্রের স্ত্রী-পুরুষ তো দূরের কথা— উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মহিলারাও শাস্ত্র চর্চা ও জ্ঞানলাভ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন তখন সাম্য মৈত্রীর বার্তা-বাহক মুসলিম সম্রাটেরা মহিলাদের জন্য যথাসম্ভব যুগোপযোগী এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। নারী জীবন-সঙ্গিনী বন্ধু, দাসী নহেন ; ইসলামের এই মহান শিক্ষাই মুসলমান সুলতানদের উদ্বুদ্ধ কোরেছিল তাঁদের রমণীদের মানসিক ও চিত্তবৃত্তির উৎ-কর্ষের দিকে। সম্রাটদের হারেমে স্ত্রী-শিক্ষার যে আলোক জ্বলে উঠেছিল সেই জ্ঞানালোকের শিক্ষা রাষ্ট্রের বহুদিক ও দেশে বহুভাবে উচ্ছ্রিত হোয়ে সে যুগের বহু রমণীকে পথের সন্ধান ও আশ্বাস-দান কোরেছে।)

মুসলমান আমলের শিক্ষাগার হিসেবে স্কুল কলেজ, মক্তব মাদ্রাসা, বিশ্ব-বিদ্যালয় ও খানকা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল তেমনি মেয়েদের শিক্ষার জন্য অসংখ্য স্বতন্ত্র মক্তব-মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল। সহশিক্ষার ব্যবস্থা মুসলিম আমলে ছিল না, একথা অবিসংবাদিত সত্য। একালের শিক্ষার্থীরা সে-কালের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই অনুদারতায় সে যুগের শিক্ষার্থীদের দুর্ভাগ্যের কথা সকৌতুকে স্মরণ করতে পারেন এবং নিজেদের সৌভাগ্যে স্মিতহাস্যও হয়ত হাসতে পারেন। এযুগের শিক্ষার্থীরা আরও আশ্চর্যবোধ করবেন যে মুসলিম আমলে মেয়েদের স্বতন্ত্র মক্তব মাদ্রাসা থাকা সত্ত্বেও পর্দা-প্রথার জন্য মেয়েরা সাধারণতঃ নিজেদের বাড়ীতে লেখাপড়া শিখতেন। এখনও অনেক ভদ্র ও প্রাচীনপন্থী মুসলিম পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য

এব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। জ্ঞানবৃদ্ধ সর্মভীরু ও বয়স্ক শিক্ষকের অভিভাবকত্বে মেয়েদের শিক্ষা দিবার এই ব্যবস্থা ক্ষীয়মান হোলেও অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে এখনও চলে আসছে। এই ব্যবস্থায় ডিগ্রী পাওয়া হয়ত সকল সময় সম্ভব হোয়ে ওঠে না কিন্তু যুগ-পরিবর্তনে বাহিরের দূষনীয় আবহাওয়া-মুক্ত হোয়ে জীবনোপযোগী সাধারণ কার্যকরী শিক্ষালাভ এতে সহজ হোয়ে ওঠে।

শিক্ষালাভের এ প্রণালী ব্যয়-সাধ্য ব'লে এ যুগেও যেমন সকলের পক্ষে এ পথ গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়, সে যুগেও তেমন হোত না। তাই বহুর কল্যাণে মক্তব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল। সাধারণের মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রচলন তেমন ছিল না। যৎসামান্য গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, বয়নশিল্প ও ঘর-সংসার বুঝে নেবার মত লেখাপড়াই অধিকাংশের জন্য যথেষ্ট ছিল। তবু মধ্যযুগের মুসলমানেরা কোরআনের আদর্শ এবং তাঁদের প্রিয় নবীর জীবন-সাধনার অনুপ্রেরণায় মেয়েদের চিৎপ্রকর্ষের ও আত্মিক-কল্যাণের দিকে যথাসাধ্য দৃষ্টি দিয়েছিল।

মুসলিম আমলে রাজপরিবারের লোকদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক সাহিত্য সঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল, সেই সাহিত্য সঙ্ঘের ভেতর দিয়ে শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ সাধিত হোত এবং সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-সাধকদের সাধনার পথ সুপ্রশস্ত হোয়ে উঠতো। রাজপরিবারের লোকদের দ্বারায় এরূপ সাহিত্য সঙ্ঘ গড়ে উঠতো বলে রাজপরিবারের মেয়েদেরকেও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত।

দিল্লীর সুলতানেরা এবং তাঁদের অধিনস্থ অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কোরেছিলেন। তাঁদের অনেকেই আপনাপন রাজত্বের মধ্যে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত কোরেছিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষার যাতে প্রসার হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখেছিলেন। চীনওয়ার সুলতান আরব

বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রজাদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকতেন। বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা তাঁর রাজধানী পরিদর্শন কোরে সেখানে ১৩টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল তার উল্লেখ কোরে গেছেন। সেখানকার মেয়েরা স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের এবং তাঁদের অধিকাংশই কোরআনের হাফেজ ছিলেন একথাও তিনি বলে গেছেন। মালওয়ার সুলতান গিয়াসুদ্দীন খিলজীও স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর হারেমের হাজার পনর পুরনারীর মধ্যে অনেকে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, অনেকেই ছিলেন গায়িকা, অনেকেই নামাজ পড়াবার এমাম এবং অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার জন্য নিযুক্ত—(Brigg's translation of Tarikhi-Ferishta, Vol IV, p 236) বাদশাহী হারেমে স্কুল শিক্ষয়িত্রীদের অবস্থিতি এই প্রমাণ করে যে তাঁরা অন্তঃপুরচারীকাদের লেখাপড়া শেখাতেন। সম্রাট আকবরের সময়ে হারেমের অধিবাসীদের রীতিমত শিক্ষা হোত। ফতেপুর সিকরীতে তাঁর প্রাসাদেই তিনি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত কোরেছিলেন। স্মিথ তাঁর 'ফতেপুর' সিকরী'তে এবং হাভেল সাহেব তাঁর 'Hand book of Agrar Taj' নামক গ্রন্থে সম্রাট আকবরের বালিকা বিদ্যালয়ের ছক এঁকেছেন। সম্রাট আকবর স্ত্রীশিক্ষার অনুগ্রাহী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এ থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

জাফর শরীফ সাহেব তাঁর 'কানুন-ই'-ইসলাম' নামক গ্রন্থে মুসলিম ভারতে স্ত্রীশিক্ষার বিবিধ নিয়ম-কানুনের উল্লেখ কোরেছেন। তিনি বলেন, সে যুগে বালিকা বিদ্যালয় তো ছিলই, এমন কি মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাবার বয়স হোলে ঘটা কোরে উৎসব করা হোত। 'জারফেশানি' নামক একরকম রঙ্গীন কাগজে হাতেখড়ি উৎসব উপলক্ষ্যে কবিতা লেখা হোত। আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে ওস্তাদজী মেয়ের পিতা-মাতার সামনে মেয়ের দ্বারা সেই কাগজের লিখিত কবিতা আওড়ে নিতেন। যখন কোন মেয়ে নোতুন বইএর নোতুন পড়া ধরতো মেয়ের পিতামাতা

তার শিক্ষককে আনন্দভোজেই শুধু আপ্যায়িত করতেন না, তাঁকে যথাযোগ্য পুরস্কারও দিতেন। কোরআন পাঠ সেকালের মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার অবশ্য পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। কোন মেয়ের কোরআন খতম হোলে ঘটা কোরে উৎসব করা হোত, ওস্তাদকে এনাম খেলাত দেওয়া হোত এবং এতদুপলক্ষ্যে সমস্ত মক্তবেরই অর্দ্ধেক দিনের ছুটি মঞ্জুর হোত। উক্ত প্রথার কিছুটা এখনও মুসলমান সমাজে কোথাও-কোথাও ভাঙাচোরা অবস্থায় চলে' আসছে।

মেয়েদের জন্য ধর্মসংক্রান্ত প্রাথমিক শিক্ষার এরূপ বিধিব্যবস্থা শুধু দিল্লীর সুলতান কিংবা মোগল রাজদরবারেই প্রচলিত ছিল না, প্রাদেশিক রাজ্যগুলোতেও এর রীতিমত চল ছিল। বিধবা মুসলিম মহিলাদের অনেকে মেয়েদের ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা এবং কোরআন শিক্ষা দেওয়া তাঁদের জীবনের ব্রত বলে' মনে করতেন আর সে মর্মে নিজেদের বাড়ীতেই তাঁরা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্যযুগের মুসলিম ভারতে এ প্রথা নানা বাধা বিপত্তি ও দৈবদুর্বিপাকের ভেতর দিয়ে এখনও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

মেয়েদের সকলের পক্ষে উচ্চশিক্ষা বা শিল্পকলায় পারদর্শিতা লাভ করা সম্ভবপর ছিল না; কিন্তু অধিকাংশই যেন প্রাথমিক শিক্ষা পেতে পারে সেদিকে শিক্ষা-ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকদের লক্ষ্য ছিল। মধ্যযুগ ছিল ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তিশাসিত। তাই স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ধর্মবোধবুদ্ধি যেন সুপুষ্ট হোয়ে ওঠে সকল শিক্ষা-তালিকায় সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হোত; বিশেষ কোরে মেয়েদের নৈতিক-জীবন যাতে বলিষ্ঠ ও সুগঠিত হয় তাদের শিক্ষা-তালিকা নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে সেদিকেই ছিল সকলের তীব্র দৃষ্টি।

এ তো গেলো সাধারণের কথা। এ ছাড়া মুসলিম ভারতের অনেক মহিলা এবং বাদশাজাদী শিক্ষা-দীক্ষায় এবং সাহিত্য ও শিল্প-সাধনায় উন্নত ও মার্জিত রুচির পরিচয় দিয়ে গেছেন। মুসলিম ভারতের ইতিহাসের

পাত। তাঁদের জীবনের সাধনায় গৌরবদীপ্ত হোয়ে রয়েছে। আলাউদ্দীন জাহান সোজের দৌহিত্রী মাহ্‌মালিক বা জালালুদ্দ্‌নিয়ার নামই শিক্ষিতা বাদশাজাদীদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা যেতে পারে। সুলতান নাসিরুদ্দীনের রাজত্বকালের বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ মাহ্‌মালিকের পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর হাতের লেখা ছিল মুক্তার মত পরিষ্কার ও ঝকঝকে, তিনি তার উল্লেখ কোরে গেছেন।

দাক্ষিণাত্যের প্রধানা নায়িকা চাঁদসুলতানা অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্না রমণী ছিলেন। তিনি শুধু যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, সঙ্গীত বিদ্যাতেও অদ্ভুতভাবে সুনিপুণ ছিলেন এবং আরবী, ফারসী, তুরকী, কানাড়ী, মারাঠা এমনভাবে আয়ত্ব করেছিলেন যে, উক্ত ভাষাগুলোতে অনর্গল কথা বলে যেতে পারতেন। চিত্র-বিদ্যাতেও তাঁর হাত ছিল। মধ্যযুগের একজন মহিলার পক্ষে যুদ্ধবিদ্যায় ও শিল্পকলায় এতটা সিদ্ধিলাভ সত্যি বিস্ময়কর। চাঁদসুলতানার মধ্যে বজ্রাদপি কঠোর ও কুসুমাদপি কোমলের অর্থাৎ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ নারীর সমন্বয় হোয়েছিল।

সম্রাট বাবরের কন্যা গুলবদন বানু বেগমের নাম মোগল আমলের মহিলাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর নিজের রচিত 'হুমায়ুন নামায়' তাঁর পাণ্ডিত্য-প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এই অসাধারণ মহিলা সাহিত্য-চর্চায় ও মূল্যবান গ্রন্থাদির সঞ্চয়নে কি ভাবে ব্যস্ত থাকতেন তাঁর 'হুমায়ুন নামায়' তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। হুমায়ুনের জীবনী ও রাজত্বের তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁর 'হুমায়ুন নামাহ্‌' ইতিহাসের ছাত্রদের প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হোয়ে থাকবে। সম্রাট হুমায়ুনের ভ্রাতুষ্পুত্রী সলিমা সুলতানাও সুশিক্ষিতা রমণী ছিলেন। ফারসী সাহিত্যে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত এবং ফারসীতে কবিতাও রচনা করতে পারতেন। 'মাখফী' এই ছদ্মনামে তিনি কবিতাদি রচনা করতেন। দীওয়ানে-সালিমা ফারসী সাহিত্যানুরাগীদের কাছে এখনও সমাদর পায়।

সম্রাট আকবরের দুধ-মা মাহাম্ আনকাহ সুশিক্ষিতা ছিলেন। লেখাপড়া শুধু নিজেই যে ভালবাসতেন তা নয়, বিদ্যার উৎসাহদাত্রীও তিনি কম ছিলেন না। সত্যকার শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে মানুষের সেবা আর হোতে পারে না তাঁর এমন বিশ্বাস ছিল। তিনি তাঁর আয়ের অধিকাংশ শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যয় করতেন এবং নিজ ব্যয়ে ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ব্যয়ও তিনি নির্বাহ করতেন। এই স্ত্রী-শিক্ষাবিদের সাধু প্রচেষ্টার ফল তাঁর সাধের কলেজটি কালের করাল গ্রাসে ধ্বংস হোয়ে গেছে কিন্তু দিল্লীর প্রাচীন দুর্গের পশ্চিম দরজার কাছে তার ধ্বংসাবশেষ এখনও এই মহিলার শিক্ষা-প্রীতির সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহান শুধু বুদ্ধি ও সৌন্দর্যেই খ্যাতনামা ছিলেন না, অসম্ভব প্রতিভাশালিনীও ছিলেন। তাঁর শারীরিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষের একটা সমন্বয় সাধিত হোয়েছিল। তিনি আরবী ও ফারসী সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মুখে মুখে কবিতা রচনা করে ছন্দ মাধুর্যে ও বাকচাতুর্যে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরকে মুগ্ধ ও বশীভূত করে রাখতেন। জাহাঙ্গীরের জীবদ্দশায়ও তিনিই সাম্রাজ্যের কঠিন ও জটিলতম সমস্যারও সুমীমাংসা করতেন। এতে তাঁর বুদ্ধিমত্তার ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্রাট সাজাহানের প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজমহল শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্যে ইতিহাসে মহত্তম স্থান অধিকার কোরে রয়েছেন। তিনিও সাহিত্যানুরাগিনী ছিলেন এবং ফারসী ভাষায় মনোরম কবিতা রচনা করতে পারতেন।

ভারতবর্ষে ইসলামের ইতিহাস সম্রাট শাজাহানের কন্যা জাহানারার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সঙ্গীত ও শিল্প-সাধনায়, জীবনী ও ইতিহাস রচনায়, বিদ্যায় বুদ্ধিতে ও বদান্যতায় মধ্যযুগে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর শিক্ষার গভীরতার জন্য তাঁকে সাম্রাজ্যের সেরা মহিলা আখ্যা দেওয়া

হোয়েছিল এবং তিনিও তাঁর এই আখ্যার মর্যাদা রক্ষা কোরেছিলেন। তাঁর অসাধারণ বিদ্যানুরাগের জন্য বাদশাহী হারেমচারিনীদের উপরে তিনি আধিপত্য করতে পারতেন। রাজদরবারের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবাদির বিধান তিনিই দিতেন এবং রাজধানীর মহিলা-মহফিলে অনুষ্ঠিত বিবিধ সভায় তিনিই সভাপতিত্ব করিতেন। ফরাসীতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তিনি উক্ত ভাষায় অনুপম কবিতা রচনা করতে পারতেন। এই মহিয়সী মহিলার বিনয় ও সৌজন্যের তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর সমাধিস্তম্ভের উপরে তাঁর নিজের রচনায় লেখা রয়েছে—'আমার কবরের উপরে কেউ যেন মাটি ও তৃণলতা ছাড়া আর কিছু না দেয়, কারণ দরিদ্রের কবরে সেগুলোই ভালো শোভা পায়।'

সম্রাট সাজাহানের চতুর্থা কন্যা জাবিন্দা বেগমও শিক্ষিতা ছিলেন। তিনিও ফারসীতে কবিতা রচনা করতেন। তাঁর রচিত বহু মরমী কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি বহু প্রশংসিত। সাতিউন্নেসা নামক আরও এক মহিলার নাম পাওয়া যায়। সুগভীর শিক্ষা ও সাহিত্যপ্রীতির জন্য তিনি সাজাহান কন্যা জাহানারার শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা হোয়েছিলেন। কোরআন, হাদিস ও ইসলামের শরাশরিয়তে তিনি দক্ষতা অর্জন কোরেছিলেন। ফরাসী সাহিত্যে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল।

সম্রাট আওরংজেবের কন্যারা সকলেই শিক্ষিতা ছিলেন। আওরংজেব তাঁর অধ্যাপকদের কাছ থেকে মনোমত ও যথোপযুক্ত শিক্ষা পেয়েছিলেন না বলে এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে তাঁর দীর্ঘ অভিযোগপত্র দেখা যায়। সেখানে তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণা নিবদ্ধ করেন। উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যতিরেকে কোন মানুষই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সত্যকার পূর্ণ মানুষ হোতে গেলে যে শিক্ষার প্রয়োজন আওরংজেব সেই শিক্ষার উল্লেখ কোরেছেন। শিক্ষা সম্বন্ধে আওরংজেবের নিজের সুচিন্তিত অভিমত ছিল, তা স্পষ্ট জানা যায়। তিনি তাঁর পুত্র-কন্যাদের শিক্ষা তাঁর নিজের মত ও আদর্শ

যতই দিয়েছেন তা আমরা ধরে নিতে পারি। তাঁর শিক্ষার আদর্শ তাঁর প্রিয় কন্যা জেবুন্নেসার শিক্ষার সার্থকতালাভ কোরেছিল। তিনি অনেক সময় ছদ্মনামে কবিতা রচনা করতেন। 'দেওয়ানে মাখফী' নামে তাঁর এক কাব্য পাওয়া যায়, তাছাড়া 'জেবুল মানুসাআত' নামেও তাঁর এক কাব্য রয়েছে। তাঁর প্রেরণাতেই মোল্লা সাফিউদ্দীন আর্দ্দেবেলী সর্বপ্রথম ফার্সীতে পবিত্র কোরআনের সুবিস্তৃত 'জেবুৎতাফসির' রচনা করেন। এই সাধ্বী রমণী সাহিত্যসেবায়, শাস্ত্রাদির চর্চায় ও জ্ঞানের সাধনায় সারা জীবন উৎসর্গ কোরে গেছেন।

এঁদের ছাড়া আরও অনেকের নাম করা যেতে পারে যাঁরা সত্যই মুসলিম ভারতে বিদুষী ছিলেন। এ থেকে প্রমাণ হবে যে মুসলমানেরা ভারতে তাঁদের রাজত্বকালে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মোটেই অনুদার ছিলেন না। এখনকার তুলনায় অবশ্য মুসলিম ভারতে স্ত্রীশিক্ষায় অগ্রসর ছিল না কিন্তু দেশ ও কালের বিচারে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল হোয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের স্নেহছায়ায় মেয়েরা যথাসম্ভব যুগোপযোগী শিক্ষার আলোকস্নাত হোয়েছিল এও সত্য। (তারপরেই মুসলমান রাজত্বের অবসানের সঙ্গে মুসলমানের জাতীয় জীবনে যে দুর্দিন নেমে এলো তাতে স্ত্রীশিক্ষা তো দূরের কথা, জাতীয়-জীবনের প্রতিপদে পতনশীলতার গতি বৃদ্ধি পেলো। ইংরাজ রাজসরকারের মুসলমানের প্রতি বিরোধিতা, মুসলমানের অহিতকর বিবিধ আইন প্রণয়ন এবং সরকারী চাকুরী থেকে তাদেরকে অপসারণ করার জন্য ধীরে ধীরে মুসলমানের জীবনে আর্থিক দুর্গতির বীভৎসতা ঘনিয়ে এলো। আর্থিক অবনতির সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য লোপ পেতে বসলো। ১৭৫৭ সাল থেকে মুসলমানদের এ পতনের শুরু এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সে পতনের পূর্ণতালাভ। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষের দিকে মুসলমানদের এ পতন রোধ করবার জন্য উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ যেভাবে প্রাণপাত করলেন, তাতে সেখানকার

মুসলমানদের কিছুকাল পরে চেতনা হলো, তারা বাঙলাদেশের মুসলমান-দের বহু আগেই চেতনালাভ করলো, কিন্তু বাঙলার অবস্থা ছিল স্বতন্ত্র। বাঙলাদেশ থেকেই যেমন মুসলমান রাজত্বের পতন এবং ইংরাজ রাজত্বের বিজয়াভিমান, তেমনি পাশ্চাত্য প্রভাব এই বাঙলাদেশেই সর্বপ্রথম শিকড় গেড়েছিল। বাঙলাদেশের বিজিত মুসলমানেরা বিজয়ী ইংরেজদের সঙ্গে কোন বিষয়েই সহযোগিতা করেনি। ইংরেজদের প্রতি তাঁদের ও তাঁদের প্রতি ইংরেজদের একটা পারস্পরিক সংশয় ও সন্দেহের ভাব রয়ে গেছিল। তাই বিবিধ আইন প্রণয়ন কোরে বাঙলার মুসলমানদের যেমন তারা আর্থিক ও সাংসারিক দুর্গতির পথ প্রশস্ত কোরেছে তেমনি দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা চালানোর সহায়তার জন্য এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সহযোগিতালাভ করার মানসে সেই আইনে তাদের সুবিধা কোরেছে প্রচুর। এমনিভাবে ইংরেজের কৃপায় মুসলমান ভূস্বামীদের স্থলে হিন্দু অর্থবান ও জমীদার-শ্রেণীর অভ্যুদয় হোয়েছে এবং অর্থপুষ্ট মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজে পাশ্চাত্য প্রভাবের হাওয়া তাই ভালভাবে বইতে পেরেছে। সারা উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরে-জের অনুগ্রহে ও পাশ্চাত্যপ্রভাবের ফলে বাঙালী হিন্দু শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে, চিন্তায় ও জীবনের সাধনায় বহুদূর এগিয়ে যেতে পেরেছে। ঠিক সেই অনুপাতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানের অবনতির চূড়ান্ত হোয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙালী মুসলমানের ঘোরতন্দ্রা যখন কাটলো, তখন দেখা গেলো কোনদিক দিয়েই বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে সে আর সমকক্ষতা করতে পারে না। তাই তাঁর অতন্দ্র অবসাদের কাটাতে গিয়ে বহুদিন চললো আচার ব্যব-হারে, পোষাক পরিচ্ছদে, শিক্ষাদীক্ষায় ও শিল্পসাহিত্যে তাদের অন্ধ অনু-করণ। স্কুল কলেজেই তাদেরই প্রবর্তিত পাঠ্যতালিকা পড়ে তাদেরই পৌরাণিক কাহিনীকে আপনার বলে মেনে নিয়ে মুসলমান গর্ব অনুভব করলো। মুসলমান পুরুষ সমাজের যখন এই অবস্থা তখন নারী সমাজ

একেবারে চেতনাহীন ও জড়ত্বপ্রাপ্ত।

কোন জাতিরই অদৃষ্টে এ অবস্থা বেশীদিন থাকতে পারে না। মেঘ কেটে যায়, সেখানে আবার রৌদ্রের ঝলক লাগে। তাই দেখা গেলো, বাঙলা দেশে মুসলমানেরা যেমন একদিন হিন্দুদের অন্ধ অনুকরণ কোরেচে তেমনি চেতনা-প্রাপ্তির সঙ্গে তাদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বহুল পরিমাণে। পুরুষের এই আন্দোলনে যে কয় বৎসরের শিক্ষা ও সাধনা রয়েছে তারির ফলস্বরূপই বাঙালী মুসলমান মহিলাদের একটা অংশের মধ্যেও এতকালের তন্দ্রাঘোর কাটানোর একটু আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। পুরুষেরা যেভাবে অনুকরণের মোহে ভেসে গেছিল পর্দাপ্রথা ও মুসলমানদের নারীর আব্রু-প্রীতির জন্য সে শিক্ষালাভও তাঁদের ঘটে ওঠেনি। তাই বাঙালী মুসলমান নারী-সমাজের সামান্য অংশটুকুকে বাদ দিলে তাঁদের হাজারকরা ন'শ নিরানব্বই জনই এখনও অন্ধকারের অতলে রয়ে গেছে বলা যেতে পারে। মুসলমান নারী-সমাজের মধ্যে বিধবা রমণীর অনেকেই মুসলমান মেয়েদের যে প্রাথমিক শিক্ষা-দান করতেন রাষ্ট্রের পরিবর্তনে ও ভাগ্যের কঠোর বিড়ম্বনায় নানান অসুবিধার মধ্যে বাঙলাদেশে তাও একেবারে নিঃশেষিত হোয়ে গেছিল। আজকের স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার দিনে পুরুষেরা যেমন আত্মসম্ভ্রমের দাবীতে জীবনের সকলক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছেন তেমনি মুষ্টিমেয় অল্প কয়েকজন অর্দ্ধ-শিক্ষিতা ও শিক্ষিতা মুসলিম মহিলাও তাঁদের স্বীয়-সমাজের বহুর কল্যাণে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে এগিয়ে আসছেন। তবু ভালো—তাঁদের আলোকলাভের প্রথম যুগে অন্ধ অনুকরণের মোহে তাঁরা ভেসে যাননি। তাঁদের মধ্যে চেতনার প্রথম প্রভাতে তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন সমগ্র মুসলিম সমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে দণ্ডায়মান। এ অবস্থায় মুসলিম মহিলারা বিপুল সংখ্যায় এতকাল শিক্ষা না পেলেও দুঃখের বা ক্ষোভের কারণ আজ আমাদের নেই। কারণ, এখন তাঁরা যে শিক্ষা পাবেন, মুসলমানের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সে শিক্ষা হবে খাঁটী শিক্ষা। তাঁরাই হবেন একালের বাঙালী মুসলমানের উপযুক্ত স্ত্রী, ভগ্নী ও মাতা। শিশুর লালন-পালনের, [illegible] ভার যাদের উপরে, তাঁরা জাগবেন

মাসিক মোহাম্মদী,
জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২